KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত
Title সমকালীন (SAMAKALIN)	Size 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number ৩/- ৩/- ৩/- ৩/-	Year of Publication : জ্যৈষ্ঠ, ১৩৬২ শ্রাবণ, ১৩৬২ ভাদ্র, ১৩৬২ কার্তিক, ১৩৬২
	Condition : Brittle / Good ✓
Editor : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নারায়ণ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

সমকালীন

নিয়মাবলী

'সমকালীন' প্রতি বাংলা মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে প্রকাশিতব্য। বৈশাখ থেকে বর্ষারম্ভ। প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য আট আনা, সডাক বার্ষিক ছয় টাকা, সডাক যাণ্মাসিক তিন টাকা চার আনা। পত্রের উত্তরের জন্য উপযুক্ত ডাক টিকিট বা রিপ্লাই-কার্ড পাঠাবেন।

'সমকালীনে' প্রকাশার্থ প্রেরিত রচনাদির নকল রেখে পাঠাবেন। ডাকটিকিট দেওয়া থাকলে অমনোনীত গল্প ও প্রবন্ধ ফেরৎ পাঠানো হয়, কবিতা ফেরৎ পাঠানো হয় না। দর্শন, শিল্প, সাহিত্য ও সমাজ-বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রবন্ধই বাঞ্ছনীয়।

'সমকালীনের' গ্রন্থপরিচয় প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও রসিক সমালোচকদের দ্বারা শিল্প, দর্শন, সমাজবিজ্ঞান ও সাহিত্য সংক্রান্ত গ্রন্থ ও ছোটগল্প, কবিতা ও উপন্যাসের বিস্তারিত ও নিরপেক্ষ আলোচনা করা হয়। দুইখানি করে পুস্তক প্রেরিতব্য।

ম্যানেজার—**'সমকালীন'** ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩
এই ঠিকানায় যাবতীয় চিঠিপত্র প্রেরিতব্য

উভয় বাংলার বস্ত্রশিল্পে
বিজয়-বৈজয়ন্তীবাহী
মোহিনী মিলস্
লিমিটেড্
(স্থাপিত—১৯০৮)
১ নং মিল
কুষ্টিয়া (পূর্ব্ব বাংলা)
২ নং মিল
বেলঘরিয়া (পশ্চিম বাংলা)
ম্যানেজিং এজেন্টস্ :
চক্রবর্ত্তী সন্স এণ্ড কোং
২২, ক্যানিং ষ্ট্রীট, কলিকাতা

বিশিষ্ট লেখক শ্রীনারায়ণ চৌধুরীর
সঙ্গীত-পরিক্রমা
সঙ্গীত সম্বন্ধীয় আলোচনা-গ্রন্থ
●
সবেমাত্র প্রকাশিত হয়েছে
প্রকাশক :
ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড্ পাবলিশিং
কোং লিঃ
৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা-৭
গ্রাম : কালচার ফোন : ৩৪-২৬৪১

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

সমকালীন

সম্পাদক
সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ● নারায়ণ চৌধুরী

তৃতীয় বর্ষ ভাদ্র ১৩৬২

THE WALLACE FLOUR MILLS CO.
LIMITED
LEADING FLOUR MILLS IN INDIA
BIGGEST UNIT
UNDER ONE MANAGEMENT
IN
ASIA

Manufacturing :
FLOUR, ATTA, RAWA, BESAN, BRAN.
Importers of WHEAT
&
Exporters of FLOUR

Managing Agents :
VISSANJI SONS & CO. LTD.
9, WALLACE STREET.
Fort, BOMBAY

Representatives :
ALSALES LIMITED
30, BENTINCK STREET.
CALCUTTA.
Phone : 23-1070

দেশবিদেশের খবরের জন্য

(১) **উইক্‌লী ওয়েষ্ট বেঙ্গল**—পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ও বিশ্বের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সংবাদপত্র। বার্ষিক ৬ টাকা, ষাণ্মাসিক ৩ টাকা।

(২) **কথাবার্তা**—সমসাময়িক ঘটনাবলী এবং সামাজিক ও অর্থ-নীতিক বিষয়াদি সম্পর্কিত বাংলা সাপ্তাহিক। বার্ষিক ৩ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১॥ টাকা।

(৩) **বসুন্ধরা**—গ্রামীণ অর্থনীতি সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ২ টাকা।

(৪) **স্বাস্থ্যশ্রী**—স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যবিধি, পুষ্টি বিজ্ঞান ও খেলাধূলা সম্বন্ধীয় বাংলা মাসিকপত্র। বার্ষিক ৩ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১॥ টাকা।

(৫) **পশ্চিম বংগাল**—নেপালী ভাষায় সচিত্র পাক্ষিক সংবাদপত্র। বার্ষিক ১॥ টাকা।

(৬) **মগরেবী বংগাল**—সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্পর্কিত সচিত্র উর্দু পাক্ষিক পত্রিকা। বার্ষিক ৩ টাকা ; ষাণ্মাসিক ১॥ টাকা।

বিঃ দ্রঃ—(ক) চাঁদা অগ্রিম দেয় ;
(খ) সবগুলিতেই বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ;
(গ) বিক্রয়ার্থ ভারতের সর্বত্র এজেণ্ট চাই ;
(ঘ) ভি পি ডাকে পত্রিকা পাঠানো হয় না।

অনুগ্রহপূর্বক রাইটার্স বিল্‌ডিংস্, কলিকাতা—এই ঠিকানায় প্রচার অধিকর্তার নিকট লিখুন।

সমকালীন

॥ সূচীপত্র ॥

তৃতীয় বর্ষ ভাদ্র ১৩৬২

প্রবন্ধ
বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা : রথীন্দ্রনাথ রায় ৯
রবীন্দ্র সঙ্গীতের সুর-দলন : সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৭
শিল্পদৃষ্টি : নারায়ণ চৌধুরী ২৪

কবিতা
তুমি এলে : বিভূতি ভট্টাচার্য ৩০
শ্রাবণ-সম্ভবা : বেণু দত্ত রায় ৩১
ময়দানের সংলাপ : অশ্রুকুমার সিকদার ৩৩
ভোর হবে : কবিকুল ইসলাম ৩৪
বাতাসের স্বর : নিকোলাউস লেনাও ৩৫

গল্প
পশ্চাদভূমি : মৃগাঙ্কনাথ ঘোষ ৩৬

উপন্যাস
পুরশ্চরণ : মদন বন্দ্যোপাধ্যায় ৪৪

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ
হীরেন বসু ৪৯

গ্রন্থপরিচয়
একতারা (সন্তোষকুমার দে) : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত ৫২

সমাজসমস্যা
উদার স্বার্থপরতা : নরেন্দ্রকুমার মিত্র ৫৩
ঘৃত শিল্পের সঙ্কট : অবিনাশ দত্ত ৫৪

পরিচালক : আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত, ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩

সমকালীন

তৃতীয় বর্ষ, ভাদ্র, ১৩৬২

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা

রথীন্দ্রনাথ রায়

দ্বিতীয় পর্যায়

১

বলেন্দ্রনাথের গদ্যরচনা সম্পর্কে রসিক সমালোচক তাঁর মুগ্ধমনের নিবেদন জানিয়েছেন: "বলিব কি 'ঘরের দরজা খুলিয়া পরম বন্ধুর মত হাতে ধরিয়া যে জগতে আমাদের টানিয়া আনিলেন বলেন্দ্রনাথ, সেখানে বর্ণবিচিত্র শোভাযাত্রা কখনও ফুরায় না এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বিভাসে ললিতে ইমনে কেদারায় বাহারে বেহাগে অনুক্ষণ কোন্ সানাই বাজিয়া চলিয়াছে?'...অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষীভূত আর অপরিচিতকে পরিচিত করিবার আকাঙ্ক্ষায় লেখক অণুবীক্ষণ ও দূরবীক্ষণ দুই যেন ব্যবহার করিয়াছেন, মনে হয়।"(১) সংস্কৃত সাহিত্য ও চিত্রসমালোচনা প্রসঙ্গে বলেন্দ্রনাথের রচনার এই বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ঐ সমস্ত সমালোচনা বলেন্দ্রনাথের চিত্ররীতির প্রথম-ধাপ এবং এই রীতির পরিণতি ঐতিহাসিক-স্মৃতিমূলক অথবা ইতিহাস-রসাশ্রিত প্রবন্ধাবলীতে। এই শ্রেণীর রচনার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়: কণারক, খণ্ডগিরি, প্রাচীন উড়িষ্যা, বারাণসী প্রভৃতি প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের ঐতিহ্যনিষ্ঠা ও সৌন্দর্যবোধ চূড়ান্ত সীমায় আরোহণ করেছে। প্রচলিত ঐতিহাসিক প্রবন্ধের সঙ্গে এই জাতীয় রচনার একটি পার্থক্য আছে। গবেষণামূলক ঐতিহাসিক প্রবন্ধে তথ্যসন্নিবেশের মধ্য দিয়ে একটি ঐতিহাসিক সত্যের সমীপবর্তী হওয়ার প্রয়াস সুপ্রকট—সেখানে তথ্য ও যুক্তির সমান্তরাল গতি—নিজের নির্ধারিত এলাকার বাইরে তার যাত্রা নিষিদ্ধ। এইজাতীয় ঐতিহাসিক প্রবন্ধে প্রধানত গবেষণার সততাই কাম্য—বস্তুর গৌরবই তার শ্রেষ্ঠ গৌরব। কিন্তু রসস্রষ্টার কাছে ইতিহাসের বস্তু-অংশ গৌণ। বস্তু ছাড়া ইতিহাসের আর একটি দিক আছে—সেদিক ইতিহাসাশ্রিত রোমান্স-রসের দিক। স্রষ্টার আপন কালের সঙ্গে যে ব্যবধান আছে, সেই

১। চিরায়ু বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর: কানাই সামন্ত—শনিবারের চিঠি, মাঘ, ১৩৬০।

অংশটুকু ভাব ও ভাবনার আস্বাদনে পরম রমণীয় করে তোলা সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ সেই কালগত ব্যবধানকে বলেছেন—"চিত্ত-বিস্ফারক দূরত্ব" (২)—ইতিহাস-নির্ভর রোমান্স-রসের মর্মমূলে এই দূরত্বেরই কলধ্বনি। বলেন্দ্রনাথ ইতিহাসের বস্তু-অংশকে বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ইতিহাস-রসকে গ্রহণ ক'রেছেন। উড়িষ্যার ঐতিহ্য, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য বলেন্দ্রনাথের মনে একটি গভীর প্রভাব মুদ্রিত ক'রেছিল। বলেন্দ্রনাথের ঐতিহ্যনিষ্ঠ শিল্পীমন অতীত উড়িষ্যাকে কেন্দ্র ক'রে ভাবচ্ছটার বর্ণ-বিচিত্র কলাপ বিস্তার করেছে—বাসনায় ও বেদনায় সে রূপ তুলনাহীন!

"খণ্ডগিরি" প্রবন্ধটিতে অতীত-স্মৃতির মনোরম পর্যালোচনার সঙ্গে প্রাচীন উড়িষ্যার ধর্মজীবনের একটি স্বল্প-পরিসর পরিচয়-রেখা আছে—তাঁর বক্তব্যকে একটি কথায় সূত্রাম্বিত করা হ'য়েছে: "খণ্ডগিরির গুহাবলীতে এই প্রাচীন ধর্মযুগের সমাধি।"—এই চারুশিল্প-রচিত গুহার চারদিকে কত মুখর ইতিহাস—বিগত দিনের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর গম্ভীরনাদি ত্রিশরণ-মন্ত্রোচ্চারণ, গিরিপ্রাঙ্গণে সান্ধ্য-ঘণ্টার নিনাদ—গুহায় গুহায় গন্ধধূপের উৎসব—সেদিনের মুখরশৈল-শিখর চোখের সামনে জেগে ওঠে। ভারতবর্ষের ধর্মজাগরণ ও শিল্পবৈভবের নিদর্শন এই খণ্ডগিরি। প্রায় দশ বছর আগে তীর্থগামী বঙ্কিমচন্দ্রের কাছেও ভারত-ঐতিহ্য ও ভারত-শিল্পের এই বিচিত্রভূমি অপরূপ ব'লে বোধ হ'য়েছিল—সেদিন বঙ্কিমচন্দ্রও আবেগ-অধির হ'য়ে বলেছিলেন: "...চারিপাশে মৃত মহাত্মাদের মহীয়সী কীর্তি। পাথর এমন করিয়া পালিশ করিয়াছিল, সে কি এই আমাদের মতো হিন্দু? আর এই প্রস্তরমূর্তি সকল যে খোদিয়াছিল—এই দিব্য পুষ্পমাল্যাভরণ ভূষিত বিকম্পিতচেলাঞ্চলপ্রবৃদ্ধ সৌন্দর্য, সর্বাঙ্গসুন্দর গঠন, পৌরুষের সহিত লাবণ্যের মূর্তিমান সম্মিলনস্বরূপ পুরুষমূর্তি যাহারা গড়িয়াছে, তাহারা কি হিন্দু?" (৩)—বঙ্কিমচন্দ্রের মতো আবেগের তীব্রতা না থাকলেও বলেন্দ্রনাথের প্রাচীন ঐতিহ্য-প্রীতি প্রগাঢ়, এই শ্রেণীর রচনাগুলিই তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ স্থল। "উড়িষ্যার দেবক্ষেত্র" প্রবন্ধটিরও মূল সুর প্রাচীন উড়িষ্যার শিল্পপ্রয়াস ও ধর্মজীবনের ঐক্য। শিল্পরীতির গ্রীক অভাব ও হিন্দুপ্রভাব বৌদ্ধকে কিভাবে কঠোর নীতিচর্চা থেকে শিল্পকলার ক্ষেত্রে টেনে এনেছিল তারই মনোরম আলোচনা। মন্দিরের দেশ উড়িষ্যার ঐতিহ্যময় পথে দাঁড়িয়ে বলেন্দ্রনাথের রসদৃষ্টির ভাবলোকে একটি রমনীয় স্মৃতিদৃশ্য জেগে ওঠে: "সম্মুখে আম্রমুকুলিত ছায়াময় প্রাচীন পথ, কাঠজুড়ির বালুগহ্বর হইতে উঠিয়া পুরুষোত্তমের দ্বার পর্যন্ত প্রসারিত। এই পথ বাহিয়া চিরন্তন মানবপ্রবাহ নিশ্চল দেবতার দ্বারে আপন বেদনা জানাইয়া আসে। মধ্যে মধ্যে ক্ষীণাঙ্গী বাসন্তী নদনদী পথের মাঝখান দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া মৃদুপ্রবাহে বহিয়া গিয়াছে। দূরে মেঘের মত নীল শৈলশ্রেণী কখনো ছায়া-সুপ্ত, কখনও রবিকিরণে উদ্ভাসিত।" "প্রাচীন উড়িষ্যা" প্রবন্ধে উড়িষ্যার বিগত দিনের কথা আলোচনা ক'রতে ব'সে লেখক একটি সঘন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন। বর্তমানের হৃতগৌরব উড়িষ্যার সঙ্গে ঐশ্বর্যময় প্রাচীন উড়িষ্যার তুলনা দিতে গিয়ে বলেন্দ্রনাথের অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগের কথাই

২। "ক্লিয়োপাট্রার বিলাসকক্ষে বীণা বাজিতেছে, দূরে সমুদ্রতীর হইতে ভৈরবের সংহার-শৃঙ্গধ্বনি তাহার সঙ্গে এক সুরে মন্দ্রিত হইয়া উঠিতেছে। আদি ও করুণ রসের সহিত কবি ঐতিহাসিক রস মিশ্রিত করিতেই তাহা এমন একটি চিত্তবিস্ফারক দূরত্ব ও বৃহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।" (ঐতিহাসিক উপন্যাস: সাহিত্য)

৩। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—প্রথম খণ্ড: সীতারাম।

বেদনার ভাষায় রূপ পেয়েছে। প্রাচীন উড়িষ্যার প্রসাধনকলা, জীবনচর্যা, ধর্মজীবন প্রভৃতির স্বল্পায়ত এক একটি ছবি ফুটেছে। বলেন্দ্রনাথের এই "ভারত পন্থা" মহিমোজ্জ্বল—দুর্ভিক্ষপীড়িত উড়িষ্যার প্রান্তে দাঁড়িয়ে মন্দিরময় উড়িষ্যার পরিত্যক্ত জীর্ণ মঠ-মন্দিরের দিকে চেয়ে সেই গৌরবান্বিত অতীতের কথা মনে হয়েছে। বলেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমিকতার সঙ্গে অতীতমুগ্ধ রোম্যান্টিকতার বেদনা মিশে আছে। মাঝে মাঝে স্মৃতি-রোমাঞ্চিত উজ্জয়িনীর ভাবনামুগ্ধ রবীন্দ্রনাথের কথা মনে হয়। "বারাণসী" প্রবন্ধটির মধ্যেও প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার কথা আছে—বারাণসীর ধারাবাহিক ইতিহাসের সঙ্গে ভারতীয় সভ্যতার পতন-অভ্যুদয়ের গভীর সম্পর্ক আছে। প্রবন্ধটিতে একটু তথ্যালোচনার প্রাধান্য থাকার জন্য এই শ্রেণীর অন্যান্য প্রবন্ধের মতো রসোত্তীর্ণ হয় নি।

এই শ্রেণীর প্রবন্ধের মধ্যে "কণারক" প্রবন্ধটিই সর্বশ্রেষ্ঠ—বলেন্দ্রনাথের যে কটি রচনায় তাঁর সৃষ্টি-নৈপুণ্য ও গদ্যরীতি চূড়ান্ত সীমায় উঠেছে এই প্রবন্ধটি তার অন্যতম। 'একটি পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয় অবলম্বন ক'রে বলেন্দ্রনাথের মণি-মাণিক্যদীপ্ত ভাষা ইন্দ্রজাল বর্ষণ করেছে। কোণারকের পরিত্যক্ত পাষাণস্তূপে কোন এক বিলুপ্তকীর্তির মায়াজাল বিস্তৃত। লেখক সেই মায়াজালের মাঝখানে জড়িয়ে পড়েছেন—কোন এক পুরাতন উপকথার নির্জন মহিমাতটে তাঁর তৃষাতুর দৃষ্টি মৌন ব্যথায় স্তম্ভিত হয়ে আছে।—কিন্তু সেই উদাসীন বেদনারই বা কী: "কণারক এখন শুধু স্বপ্নের মত, মায়ার মত; যেন কোন প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার শৈবালশয্যায় এখানে নিঃশব্দে অবসিত হইতেছে—এবং অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মিরেখায় ক্ষীণপাণ্ডু মৃত্যুর মুখে রক্তিম আভা পড়িয়া সমস্তটা একটা চিতাদৃশ্যের মতো বোধ হয়।"—একটি বিলীয়মান গরিমার বিস্ময়কর চিত্র। বাংলা সাহিত্যের একজন বিশিষ্ট সমালোচক বলেন্দ্রনাথের এই রচনাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "মন্দির" প্রবন্ধটির তুলনা করেছেন (৪)। অবশ্য রচনা দুটির মধ্যে অনেকখানি ভাবগত সাদৃশ্য আছে—একটি কোণারকের মন্দির, আর একটি ভুবনেশ্বরের মন্দির। ভুবনেশ্বরের প্রস্তরপুঞ্জে রবীন্দ্রনাথ অতীত ইতিহাসের স্তম্ভিত মূর্তি দেখেছেন: "যখন ভারতবর্ষের জীর্ণ বৌদ্ধধর্ম নবভূমিষ্ঠ হিন্দুধর্মের মধ্যে দেহান্তর লাভ করিতেছে, তখনকার সেই নব-জীবনোচ্ছ্বাসের তরঙ্গলীলা এই প্রস্তর-পুঞ্জে আবদ্ধ হইয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্তে যুগান্তরের জাগ্রত মানবহৃদয়ের বিপুল কলধ্বনিকে আজ সহস্র বৎসর পরে নিঃশব্দ ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিতেছে।" (৫) কিন্তু বলেন্দ্রনাথের রচনাটির সুরধর্মীতা ও শাব্দিক ইন্দ্রজাল যে মায়াময় স্বপ্নরাজ্যের ইঙ্গিত দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথের রচনায় তা' অনুপস্থিত! রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধটি উড়িষ্যা-সম্পর্কিত অন্য দুটি রচনার সমকক্ষ হ'লেও, "কোণারক" রচনাটির মূল্য স্বতন্ত্র। "কোণারক" ও "মন্দির"—এ দুয়ের মিল নিতান্ত বহিরাশ্রয়ী। "কোণারকে"র সেই প্রাচীন উপকথার বিস্মৃতপ্রায় উপসংহার ঘিরে যে বেদনাতুর দীর্ঘশ্বাসের ছায়া হৃদয়াবেগের স্পন্দনে আলোড়িত, "মন্দির" প্রবন্ধে সেই জাতীয় দীর্ঘ-বিসর্পী ব্যঞ্জনা কোথায়? এই ব্যঞ্জনাটুকুই এর প্রাণ। অন্ততঃ এই রচনাটিতে বলেন্দ্রনাথ তাঁর পিতৃব্যকে অতিক্রম ক'রেছেন।

৪। বাংলা সাহিত্যের একদিক: শশিভূষণ দাসগুপ্ত।

৫। মন্দির: ভারতবর্ষ।

২

বলেন্দ্রনাথের কতকগুলি রচনাকে বিশুদ্ধ বর্ণনামূলক রচনা বলা চলে। "আষাঢ় ও শ্রাবণ," "শরৎ ও বসন্ত," "বোম্বায়ের রাজপথ," "লাহোরের বর্ণনা" প্রভৃতি প্রবন্ধ এই শ্রেণীভুক্ত। এখানে বর্ণনাই মুখ্য, যে কোন জায়গার বর্ণনাই হোক, অথবা কোন প্রকৃতির বর্ণনাই হোক। বলেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর রচনাতেও বিষয়বস্তুর এমন কিছু অসাধারণত্ব নেই, কিন্তু অতি সামান্য অবলম্বনকে নিয়েই বলেন্দ্রনাথের স্পর্শ-সচেতন মন শততন্ত্রী বীণার মতো ঝঙ্কার তোলে। প্রত্যেকটি বস্তু-অংশ যখন এক নূতন দেখায় ও নূতন ভাবনায় রসায়িত হয়ে ওঠে, তখন নূতন এক একটি ভাবচ্ছবিতে পরিণত হয়। এর কোনটি বা ল্যাণ্ডস্কেপ, কোনটি বা রেখাচিত্র, কোনটি আবার হয়তো বহুবর্ণরঞ্জিত স্থিরচিত্র। সবটুকু মিলে এক বিস্ময়কর কবিদৃষ্টি রচনাগুলির নেপথ্যরাগিণী। এখানেও বলেন্দ্রনাথের চিত্রধর্মী রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি চোখে পড়ে। "বোম্বায়ের রাজপথ" রচনাটি কতকটি চলমান ছবির শোভাযাত্রা—লেখক নিপুণতার সঙ্গে সেই ছবিগুলি তুলে নিয়েছেন। বোম্বাইয়ের ভৌগোলিক পরিস্থিতিকে অতিক্রম ক'রে যে দৃশ্যপট উদ্ঘাটিত হয়েছে তা একজাতীয় ভাবরূপ—বলেন্দ্রনাথের কবিমনের পক্ষে প্রাচীন কোণারক অথবা দূরকালের উজ্জয়িনীর কোন প্রয়োজন নেই, আধুনিক বোম্বাই বা লাহোরই তাঁর ভাবচ্ছবি রচনার পক্ষে যথেষ্ট। কলকাতা ও বোম্বাই সহরের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনা ক'রেছেন ও বোম্বাইয়ের তুলনায় কলকাতার বর্ণদৈন্যের কথা ব'লেছেন, তা' পড়তে পড়তে রবীন্দ্রনাথের এই জাতীয় বর্ণনার কথা মনে পড়বে(৬)। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের রচনাটির বৈশিষ্ট্য অন্যত্র—অত্যন্ত প্রাত্যহিক ও কাছের জিনিষকে নিয়েই তাঁর কল্পনার ভ্রমরী কলগুঞ্জন ক'রে ওঠে। আধুনিক বোম্বাই শহরকে তিনি যে দৃষ্টিতে দেখেছেন তা' অতীতকালের বিলুপ্ত নগরীর ভগ্নস্তূপ-দেখা দৃষ্টির চেয়ে কোনো অংশে কম রমণীয় নয়—সর্বত্র মোহবিজড়িত একটি স্বপ্নাবেশ: "সমুদ্রের উপকূলে বৃহৎ বোম্বাই পুরী যেন পাশ্চাত্য শিল্পীর অঙ্কিত বিস্তীর্ণ পটের উপরে প্রাচ্য উপন্যাসের একটি মায়াচিত্র। মালাবার শৈলশিখর হইতে তরুণ শ্যামিমা নামিয়া আসিয়া নিম্নভূমির নারিকেল তরুকুঞ্জে নিঃশব্দে মিশিয়া গিয়াছে এবং এই মোহময়ী প্রকৃতির নিবিড় কুঞ্জবন মধ্য হইতে সহস্র অভ্রংলিহ প্রাসাদশিখররাজি উঠিয়া বোম্বায়ের রবিকরদীপ্ত সমুদ্রবেলায় একটি চিত্রার্পিত রমণীয়তা অর্পণ করিয়াছে।"—"লাহোরের বর্ণনা" একটি অসমাপ্ত রচনা। আর্যসমাজের কর্মোপলক্ষে বলেন্দ্রনাথের সঙ্গে পাঞ্জাবের যোগ ঘনিষ্ঠতর হ'য়েছিল—"লাহোরের বর্ণনা" রচনাটি তারই ফল। রচনাটি অসমাপ্ত—কিন্তু বলেন্দ্রনাথের রচনারীতির বৈশিষ্ট্য পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান। বর্তমান লাহোরের মধ্যে লেখক দেখেছেন "আরব্যমরীচিকার ছায়া"। বোগ্‌দাদের অসংখ্য বিস্মৃত দিনের কথা তাঁর মনে পড়ে। পাঞ্জাবের বসন্ত-বর্ণনার স্বল্পায়ত চিত্রটি বর্ণ-গন্ধ-স্পর্শাতুরতায় মদির—বিশ্ব-প্রকৃতির অবারিত প্রাচুর্য-রূপ-সমৃদ্ধ: "বেগবান পবন তাহার বাহন, সূর্য তাহার রথচক্র, এবং রৌদ্রোজ্জ্বল বসন প্রান্তে শুভ্র বিকশিত নাসপাতির ফুল এবং তাহার রেণুপাটল দোধুয়মান উত্তরীয়চ্ছন্দে নেবুমঞ্জরীর সৌরভ।"—অতি সহজেই বিশ্বপ্রকৃতির এই "পারসোনিফিকেশ্যান" সংস্কৃত কাব্য-রসিকের কাছে বিচিত্র নয়।

৬। বোম্বাই শহর: পথের সঞ্চয়।

কালিদাসের "ঋতুসংহার"এর পাঠকের কাছে এ চিত্র এমন কিছু নূতন নয়। সংস্কৃত কাব্যসমালোচক বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতীয় কবিদেরই পন্থানুসারী।

বলেন্দ্রনাথের অনেকগুলি রচনা ব্যক্তিগত প্রবন্ধ বা "পার্সোনাল এসে" জাতীয় রচনা। বর্তমানকালে এই শ্রেণীর রচনার ক্রমপরিণতি ও প্রাচুর্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলা সাহিত্যের ব্যক্তিগত প্রবন্ধের ইতিহাসে বলেন্দ্রনাথের একটি বিশেষ স্থান আছে। ঋতুবর্ণনামূলক রচনাগুলির মধ্যেও ব্যক্তিগত সুরটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে— এখানে রচনারীতির একটি বিশিষ্ট সমন্বয় লক্ষ্যণীয়। একদিকে চিত্ররীতি ও আর একদিকে সঙ্গীতরীতি কোথায়ও এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে দেখা দেয় নি। "আষাঢ় ও শ্রাবণ" রচনাটিতে আত্মভাবমুগ্ধ কবিহৃদয় খুব সহজেই আষাঢ় ও শ্রাবণের অন্তঃপ্রকৃতির পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন। কাব্যবর্ণিত এই দুটি মাসের বর্ণনায় লেখকের মধ্যে একটি অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কবি-মনেরও পরিচয় পাওয়া যায়। বৈষ্ণব কবি উদ্ধবদাসের দুটি পদের তুলনা দিয়ে লেখক রসিক সমালোচকের ভূমিকাও নিয়েছেন: "আষাঢ়ের দুঃখ গভীর বটে, কিন্তু কেমন যেন একটু আশা আছে। শ্রাবণে কেবলই অন্ধকার ঘনাইতেছে—কোথায় আশা কোথায় ভরসা! আষাঢ়ে মেঘের দিকে চাহিয়া তাহার কথা মনে করিতে পারা যায়—মনে হয়, এমনিতর মেঘের মতো সে-ও যদি আসে। শ্রাবণে সব একেবারে স্তম্ভিত।"—"শরৎ ও বসন্ত"-ও এই শ্রেণীর রচনা, কিন্তু এই রচনাটিতে সঙ্গীত-রীতিটি গৌণ। কাব্যবর্ণিত শরৎ ও বসন্তের চিত্র ঘিরে একটি ভাবাচ্ছবির অপরূপত্বের প্রকাশ—ভাবচ্ছবির প্রকাশের জন্য যে দৃষ্টিনিপুণ কবিমনের প্রয়োজন বলেন্দ্রনাথের সেই ক্ষমতা ছিল, তাই প্রচলিত কতকগুলি কবি প্রসিদ্ধির সঙ্কলনে পর্যবসিত হয় নি। ঋতু-আশ্রয়ী ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলির মধ্যে "শ্রাবণের বারিধারা" রচনাটিই শ্রেষ্ঠ। কবির কল্পবৃত্তি যেন শ্রাবণ ধারার মতোই বিগলিত।—শ্রাবণের নিবিড় ধারাবর্ষণে, কালোছায়ার অস্পষ্টতায় যে আবেশ ঘনিয়ে ওঠে তারই সঙ্গে বলেন্দ্রনাথের হৃদয়ের একটি ঘনিষ্ঠতা আছে। বলেন্দ্রনাথের ভাবাবিষ্ট নিকটতম প্রতিবেশী শ্রাবণ—তাই শ্রাবণের গহন-গভীরে আচ্ছন্নপ্রায় কবিমন অবগাহনের আনন্দে উতলা হ'য়ে ওঠে: "তুমি শুধু ঝরিয়া যাও—তোমার ঝরঝরে বর্ষে বর্ষে এমনি নূতন কাব্য রচিত হোক। আমরা সেই কাব্যের সৌন্দর্যে ডুবিয়া একটু আনন্দ উপভোগ করি।"—এ যেন সেই কবি-বর্ণিত "তোমার রূপে মরুক ডুবে, আমার দুটি আঁখির তারা।"—ব্যক্তিগত প্রবন্ধের একটি বৈশিষ্ট্য এই যে আপন রসানন্দটুকুর স্বচ্ছন্দ-সঞ্চরণ সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া যায়।

"ঊষা ও সন্ধ্যা," "গোধূলি ও সন্ধ্যা," "সন্ধ্যা," "ভাদ্রমাসের ভরাগঙ্গা" প্রভৃতি রচনায় বলেন্দ্রনাথের ভাবুকতা, কল্পনাশক্তি ও গীতিধর্ম প্রথম শ্রেণীর গীতিকবির উপযুক্ত। কাব্যের ক্ষেত্রে বলেন্দ্র-প্রতিভার সমগ্রতা নেই, অনেক অপরিণতির চিহ্ন বিদ্যমান—কিন্তু গদ্যে রচিত ব্যক্তিগত প্রবন্ধগুলিতে বলেন্দ্রনাথের কবিশক্তির পূর্ণতা আছে। রচনাগুলি স্বল্পায়ত, এক একটি স্ফটিক-দ্যুতি ভাব-বিন্দুর মতো—রচয়িতার অন্তরঙ্গ ব্যক্তি-পুরুষের স্পষ্ট প্রতিফলনে উদ্ভাসিত। সেই ভাব-বিন্দুটুকুকে কবির হৃদয়-শিহরণ একটু আলোড়িত করে—মৃদু-স্পন্দনের বিস্তার একটু সুখাবেশ-স্নিগ্ধ লীলা-লাবণ্য জাগিয়ে তোলে—সেইটুকুই এই জাতীয় রচনার প্রাণ।

"চন্দ্রপুরের হাট," "বনপ্রান্ত," "পুলের ধারে," "পুরাতন চিঠি," "জানালার ধারে" প্রভৃতি রচনা বলেন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও আত্মনিষ্ঠ রচনা। প্রথম তিনটি রচনায় কিছু অপরিণতির চিহ্ন আছে—কিন্তু আত্মনিষ্ঠ স্বগত-ভাষণের সঙ্গে পরিতৃপ্তির আমেজটুকু সর্বত্র-পরিব্যাপ্ত। কোন কোন সমালোচকের মতে শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধের বড় লক্ষণ তার অন্তরঙ্গভাষণ (৭)। খুব অল্পবয়স থেকেই বলেন্দ্রনাথ এই আর্টে সিদ্ধকাম। "চন্দ্রপুরের হাট" এবং "বনপ্রান্ত"—রচনা দু'টি পল্লীগ্রামের সহজ সুন্দর রেখাঙ্কন, বিস্তৃত চিত্রপট এখানে অনুপস্থিত। কিন্তু এখানে শুধু পল্লীপ্রকৃতিই নেই, পল্লীর মানুষের সমস্যা-বিরল জীবনটুকুও আছে। এই দু'টি রচনায় ব্যক্তিগত প্রবন্ধ ও ছোটগল্পের মধ্যপথ অবলম্বন করা হ'য়েছে—ভাষা ঘরোয়া, অথচ বলেন্দ্রনাথের রচনারীতির সহজ-স্নিগ্ধতা অলক্ষ্য গোচর নয়। পল্লীপ্রকৃতি ও পল্লীর মানুষের এই দৃশ্য-সৌন্দর্যকে একটু দূর থেকে অলস ভাবদৃষ্টির সাহায্যে গেঁথে তুলেছেন। বলেন্দ্রনাথের এই সহজ অরূপ অথচ অতিতুচ্ছ জীবনের আকর্ষণ চকিতে এক একবার বিভূতিভূষণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বলেন্দ্রনাথের সমস্ত ব্যক্তিগত প্রবন্ধের মধ্যে শ্রেষ্ঠ "জানালার ধারে" ও "পুরাতন চিঠি"। এখানে বক্তব্য সামান্যই, প্রায় কিছু নেই বললেই হয়—কিন্তু বলেন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ উপস্থিতিতে যৎসামান্যই অসমান্য হ'য়ে ওঠে। ছোট্ট একটু ঘর, আসবাবপত্রও সামান্যই—সামনের ডেস্কে লেখার সরঞ্জাম—চেয়ারে হেলান দিয়ে বাইরের দিকে অলসভাবে শুধু চেয়ে দেখা—কোলের ওপর অস্পষ্ট চন্দ্রালোক। বাহিরের পৃথিবীর সুখদুঃখ থেকে বিস্মৃত হ'য়ে এই নির্জন-নিভৃতে আপনার মনে শুধু খেলা করা: "আমি সংসারের সুখের মাঝে বাহির হইনা, এই চিরম্লান পরিত্যক্ত ছায়ার পার্শ্বে এমনি বসিয়া থাকি, মানব-হৃদয়ের ছায়াময়ী বেদনা অনুভব করি।"—ইংরেজ কবি বর্ণিত "Sad music of the humanity"(৮) বলেন্দ্রনাথের কাছে অনায়াস-আয়ত্ত—এত গভীর তাঁর অনুভবশক্তি! "পুরাতন চিঠি" রচনাটি ব্যক্তি বলেন্দ্রনাথের শেষ আবরণটুকুও উন্মোচিত ক'রেছে—কাছের মানুষ হয়ে আমাদের ঘনিষ্ঠ বন্ধু হয়ে উঠেছেন যেন। পুরাতন চিঠির এক জাতীয় রস আছে—সে রস পুরাতনের রসও বটে, আবার পত্রলেখকের হৃদয়ের রসও বটে। পুরাতন চিঠির কালির ঈষৎ ম্লান রেখায় বহু স্নেহ-সখ্যের নিদর্শন আছে। চিঠিগুলির প্রতি অপরিসীম মায়া ও স্নেহানুগত্য রচনাটির মধ্যে স্বতোৎসারিত—এই চিঠিগুলি কর্মাবরল মুহূর্তের নিভৃত আস্বাদনকে পরিতৃপ্ত করে। চিঠির মধ্যে ব্যক্তিত্বের আস্বাদন আছে,—সেই বন্ধু-ব্যক্তিত্ব-মুগ্ধ একটি বিরল ভাবুকতা এই সংক্ষিপ্ত রচনাটির মধ্যে বিস্তৃত। বলেন্দ্রনাথের স্মৃতি-চেতন মনের পরিচয় তাঁর ঐতিহাসিক স্মৃতি পরিবেশনের মধ্যে আছে, কিন্তু সে পরিচয় স্মৃতিচারণার রাজপথ, গরিমাময় ঐতিহাসিক পথ। "পুরাতন চিঠি" প্রবন্ধটির স্মৃতিরসের জন্য কোন গৌরব-মুখর ইতিহাসের প্রয়োজন নেই, বন্ধুজনের পুরাতন চিঠির বিবর্ণ পাতাগুলিই যথেষ্ট। এগুলি যেন স্মৃতির প্রায়ান্ধকার গলিপথ। কিন্তু তার মূল্যও কি কম? বন্ধুর স্বহস্ত-অঙ্কিত অর্ধসমাপ্ত ছবি একটুকরো পেন্সিলে—সব কিছু তুচ্ছ আজ অসামান্য গৌরবে উদ্ভাসিত: "আমি বর্তমান শ্রান্ত পথিক, মধ্যে মধ্যে এই পুরাতনের স্নেহে শান্তি লাভ করিতে আসি। চুপি চাপি আমার শৈবালাচ্ছন্ন অতীতের সমাধি মন্দিরে গিয়া একা একা বসিয়া থাকি। একটি পেন্সিলের দাগে, দুইটি পুরাতন হাতের অক্ষরে আমার সমস্ত পুরাতন—আমার সমস্ত অতীত।"—বলেন্দ্রনাথের সময়ে ব্যক্তিগত

৭। "Most of us think of the ideal essay as a kind of private rather than of public talk." —Robert Lynd

৮। Tintern Abbey: Wordsworth.

প্রবন্ধ রচনার শৈশবকাল বললেও হয়—কিন্তু সেই সময়েই তাঁর ব্যক্তিগত প্রবন্ধের যে সুপরিণত রূপ চোখে পড়ে তা বিস্ময়কর।

৩

বলেন্দ্রনাথের সামাজিক প্রবন্ধগুলির একটি বিশিষ্ট সুর আছে। এই সুর বর্তমান বাংলা সাহিত্যে নিতান্ত দুর্লভ বললেও হয়। স্বদেশ ও স্বদেশাত্মার যে উপলব্ধি তাঁর ইতিহাসাশ্রয়ী ঐতিহ্যপ্রীতির মধ্যে সঞ্চারিত, তাই আমাদের গৃহাঙ্গন ও পারিবারিক জীবনের মধ্যেও একটি কল্যাণ-সুন্দর জীবনাদর্শের ছবি ফুটিয়ে তুলেছে। বলেন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতা শুধু ইতিহাসের দুর্গ প্রাচীরের আড়ালেই নিজেকে নিঃশেষিত করেনি, আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের তুচ্ছতার ওপরেও তার স্নিগ্ধোজ্জ্বল ছায়া ফেলেছে। আমাদের গৃহজীবনের আড়ালে, আচার-আচরণে, উৎসবে-লৌকিকতায়, রূপসজ্জায়-প্রসাধনে যে শিব-সুন্দরের পরিপূর্ণরূপ ফুটে উঠেছে তাকেই তুলে ধরেছেন। বাঙালী গৃহস্থজীবনের কল্যাণস্নিগ্ধ মাধুর্যের যে একটি বিশেষ দিক আছে, বলেন্দ্রনাথের সৌন্দর্যদৃষ্টি তাকে বিস্মৃত হয়নি। তাঁর স্বল্পায়ু জীবনে স্বাদেশিকতার যে দীক্ষা—তা' শুধু বাইরের একটি যুগোচিত আচরণমাত্র নয়, তাঁর প্রত্যক্ষনিষ্ঠ উপলব্ধিও বটে—এইখানেই তাঁর ব্যক্তিজীবন ও শিল্পীজীবনের সমন্বয় হয়েছে। তাঁর সামাজিক রচনাগুলি থেকে তারই প্রমাণ পাওয়া যায়। ভূদেব মুখোপাধ্যায় তাঁর আচার প্রবন্ধ, পারিবারিক প্রবন্ধ, সামাজিক। প্রবন্ধ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বাঙালীকে এই বিষয় সর্বপ্রথম সচেতন হ'তে বলেন। আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী যথার্থই বলেছেন: "বৃদ্ধ ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের গুরুগম্ভীর উপদেশে নব্যবঙ্গ কর্ণপাত করা উচিত মনে করে নাই; মনীষী রবীন্দ্রনাথ যে মঙ্গলশঙ্খ মুহুর্মুহু ধ্বনিত করিয়া পথভ্রান্ত স্বদেশীকে আপন ঘরের লক্ষ্মীমন্দিরের কল্যাণপীঠের অভিমুখে প্রত্যাবর্তনের জন্য আহ্বান করিতেছেন, অধিক দিনের কথা নহে, সে শঙ্খঘোষও তখনও শুনা যায় নাই। কাজেই বাঙালীর অন্তঃপুরে, বাঙালীর গৃহস্থালীতে, সামাজিক প্রথার ও দৈনন্দিন ক্রিয়াকর্মে যাহা সত্য আছে, যাহা সুন্দর আছে, যাহা শিব আছে, তাহা সহসা আবিষ্কৃত করিয়া বলেন্দ্রনাথ অন্ধকে দৃষ্টিদানে ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন (৯)।"—বলেন্দ্র-প্রতিভার একটি প্রৌঢ় ফলশ্রুতির দিকেই রামেন্দ্রসুন্দর আমাদের সচেতন করেছেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে একটি উপদেশাত্মক ও নৈতিক দিক আছে—তাঁর বক্তব্য মূল্যবান সন্দেহ নেই, কিন্তু বক্তব্য প্রকাশের ভাষা শিল্পীর নয়, নীতিবাদীর। বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনার কোন উপদেশ অথবা নৈতিক শাসন নেই—তিনি শিল্পীর দৃষ্টি দিয়েই আমাদের পারিবারিক, সামাজিক ও প্রাত্যহিক জীবনকে দেখেছেন। এই কারণে তাঁর রচনার সাহিত্যিক মূল্যও অনস্বীকার্য।

"প্রাচ্য প্রসাধনকলা," "নিমন্ত্রণসভা," "শ্রীহস্ত," "শুভদৃষ্টি," "লক্ষ্মীশ্রী," "কল্যাণীমূর্তি," "শুভ উৎসব," "শিব-সুন্দর" প্রভৃতি রচনায় আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের একটি নম্র-সুন্দর মূর্তি প্রকাশিত হয়েছে, আবার সৌন্দর্যের কল্যাণ-পরিণামের আদর্শও ধরা দিয়েছে। "প্রাচ্য প্রসাধনকলা" প্রবন্ধে প্রাচ্য প্রসাধনের বৈশিষ্ট্য একটি বক্তব্যেই পরিস্ফুট হয়েছে: "প্রাচ্য প্রসাধনকলার এই যে একটি নিরুদ্বেগ সহজ গার্হস্থ্যভাব, ইহাতেই ইহা রমণীয় এবং এই ভাবের গুণেই কবিহৃদয়ে ইহা এমন সহজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।"—প্রাচ্য প্রসাধনকলার সঙ্গে বিশ্ব-প্রকৃতির সংযোগসূত্র ঘনিষ্ঠতর—বলেন্দ্রনাথ প্রাচীন সাহিত্য থেকে রমণীয় রূপসজ্জা চয়ন ক'রে নূতন একটি রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন, ভাষার ঐশ্বর্যে ও শব্দের ইন্দ্রজালে একটি স্বতন্ত্র রূপরচনার প্রয়াস লক্ষ্যণীয়। বিশ্বপ্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্য ও বর্ণ-পরিবর্তন প্রাচ্যনারীর প্রসাধনকলার রূপবৈচিত্র্যের মূল কারণ: "ঋতুতে ঋতুতে তরুলতা-পুষ্প-পল্লবে যেমন বিচিত্র রাগ সঞ্চারে নব নব চাঞ্চল্য অনুভূত

৯। বলেন্দ্র-গ্রন্থাবলীর (১৯০৭, আগষ্ট) ভূমিকা।

হয়, আমাদের স্ত্রীনিকুঞ্জেও সেইরূপ যেন কখনও নীলাম্বরীতে, কখনও কুসুম্ভরক্তবস্ত্রে, কখনও বাসন্তী বসনাঞ্চলে প্রকৃতির সেই অন্তরের পুলকরশ্মি বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।"—আমাদের সামাজিক উৎসব সম্মেলন প্রভৃতির মধ্যে একটি ভাবাত্মক দিক ছিল। একটি পরিচ্ছন্নতা, প্রসাদগুণ ও ঔদার্যের দিক ছিল। বাইরের আড়ম্বরের চেয়ে বৃহত্তর কল্যাণের দিক বড় হ'য়ে উঠেছিল। একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে সেদিনও কোন ভাঙন ধরে নি—অতিথির জন্য তার দ্বার ছিল অবারিত। তাই সে দিনের উৎসবে নিমন্ত্রণে-লৌকিকতায় হৃদয়ের ভাগই অকুণ্ঠ হ'য়ে উঠেছে। একটি শুভ্র-সৌজন্য ও বিনয়-নম্রভাব তার মধ্য দিয়ে পরম রমণীয় মূর্তিতে ধরা দিয়েছে। তাই বর্তমান-জীবন-যাত্রার "অফিসী" ছাঁচকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। তাই তিনি বাঙালাদেশের কল্যাণী গৃহবধূদের সম্বোধন ক'রে ব'লেছেন : "হে গৃহিণি, তোমার তকতকে গৃহপ্রাঙ্গণে পুরাতন দিনের মতো আমাদিগকে আহ্বান কর এবং তুমি স্বহস্তে পাতে পাতে অন্ন পরিবেশন করিয়া সকলের পরিতোষ সাধন কর। তোমার ভাণ্ডার অক্ষয় হউক, তোমার কীর্তি অবিনশ্বর হউক।"—আমাদের ব্রত-পার্বণ ও অনুষ্ঠানসমূহের কল্যাণশ্রী তাঁকে মুগ্ধ ক'রেছে। আমাদের পুরাতন জীবনযাত্রা ও গার্হস্থ্যচর্যায় যে স্নিগ্ধতা ছিল, তাকেই বার বার স্মরণ ক'রেছেন—এইভাবে অনুকরণ-বিলাসী আমাদের বহির্মুখীদৃষ্টিকে পরিচিত গৃহাঙ্গনের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। অবশ্য আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের সঙ্কোচন ও ভাঙনের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন নি। পুরোনো দিন যখন ফিরবে না তখন নূতন কালে সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের নূতন কাঠামোর ইঙ্গিত তাঁর রচনায় নেই। কিন্তু দেশ-জাতি ও ঐতিহ্যের প্রতি আন্তরিকতা ও জাতীয় আদর্শের প্রতি প্রীতিবোধ বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনাকে একটি স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে—য' বাংলা-সাহিত্যে অত্যন্ত বিরলদৃষ্ট।

বলেন্দ্রনাথের এই জাতীয় রচনার অধিকাংশই তাঁর জীবনের শেষ দিকে লেখা। এই সময় বলেন্দ্রনাথের নন্দন-স্বপ্ন একটি বৃহত্তর পরিণতির দিকে চলেছিল। প্রথম দিকের সংস্কৃত-কাব্য-সমালোচনা, চিত্র-সমালোচনা প্রভৃতিতে এক জাতীয় নন্দনতত্ত্ব-বিলাসিতা ও কলা-কৈবল্যবাদের লক্ষণ ছিল। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুখচারী সৌন্দর্যমুগ্ধতা একটি অপরিণত বাসনার মতোই আত্ম-বিহ্বল হয়ে উঠেছে—যেন রক্তিম সফেন-মদিরা। কিন্তু বলেন্দ্রনাথের অপেক্ষাকৃত পরিণত মন সেই রূপের রঙমহলেই পরিতৃপ্তি লাভ করে নি। তাই বিশুদ্ধ সৌন্দর্যচর্চাকে সম্ভবত অপূর্ণ ব'লে বোধ হয়েছিল—তাই সৌন্দর্যের সঙ্গে শুভবোধ, কল্যাণীশক্তিকেও অনুভব করতে হ'য়েছে। "শিবসুন্দর" প্রবন্ধে বলেন্দ্রনাথের কল্যাণ-পরিণাম সৌন্দর্যবোধের সুপরিণত আদর্শের কথা উচ্চারিত হয়েছে : "আমাদের মনে সৌন্দর্যের সহিত সর্বত্রই একটি বিশেষ শুভভাব বিজড়িত। সুন্দরীর রূপবর্ণনায় এই জন্য কথায় কথায় লক্ষ্মীর সহিত তাহার উপমা দিয়া থাকি···।" সৌন্দর্যের পরিণতি প্রশান্ত-মধুর কল্যাণে, মঙ্গল ও অভবোধের দীপ্তিতে। সৌন্দর্যের সঙ্গে কল্যাণ যুক্ত হওয়াতে পারিবারিক ও গৃহজীবনের প্রাঙ্গণে তাকে সহজেই পাওয়া যায়। ভারত-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের ইতিহাসে এও একটি বড় দান—আমাদের গৃহজীবন ও সমাজজীবনকে কল্যাণে, পুণ্যে, সৌন্দর্যে রমণীয় ক'রে তোলা। বলেন্দ্রনাথের সুন্দর সুধারূপিনী—"সুধাপাত্র" ও "বিষভাণ্ডের" দ্বন্দ্ব তাঁর কবিচরিতে নেই। সৌন্দর্যের লক্ষ্মীসত্তাই তাঁর উপজীব্য, উর্বশীর অপ্সর-বিলাসকে তিনি দেখতে পান নি। "বলাকা" কাব্যের "ছয় নারী" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সে পরিচয় দিয়েছেন। আবার বলেন্দ্রনাথ কীট্‌স-ধর্মী হয়েও কীট্‌সের বিশুদ্ধ সৌন্দর্যেই সিদ্ধি। কিন্তু তিনি এক সময় সৌন্দর্যের ওপরে আরো কিছু চেয়েছিলেন। সে চাওয়া বোদলেয়ারের মতো বিষপুষ্পের অনুসন্ধান নয়, আপাত অসুন্দরের মধ্যে সুন্দরের লীলাচিত্রন নয়। সে চাওয়া সুন্দরেরই বিশ্বাস-মুগ্ধ অনুসরণ—যার আর এক নাম কল্যাণ। বলেন্দ্রনাথের সিদ্ধি ও সীমা এইখানেই।

রবীন্দ্র-সংগীতের সুর-দলন

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্রষ্টার চেয়ে টীকাকারদের সংখ্যা যে বেশী হবে এটা স্বাভাবিক। কেন না সৃষ্টি করতে লাগে কল্পনা, ধারণা, জ্ঞান ও প্রেরণা, আর টীকা করতে জ্ঞানের দরকার থাকলেও, বেশীর ভাগ টীকায় যা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে টীকাকারের নিজের মত ও নিজের খেয়াল। এগুলিকে টীকাকার স্রষ্টার মত বলে চালিয়ে দেবার চেষ্টা করে। তাই রুজির ক্ষেত্রে টীকাদারের টীকাদারির ফাঁদ থেকে বাঁচাই যেমন খেটে-খাওয়া লোকের কাম্য, সৃষ্টির ক্ষেত্রে, বিশেষ করে রস-সৃষ্টির ক্ষেত্রে টীকাকারদের টীকাদারির খুর্পি থেকে বাঁচাই হচ্ছে রস-দরিয়ার ডুবুরীদের লক্ষ্য। এ হুঁশিয়ারীটা বিশেষ করে এ যুগে খুবই দরকার কেন না শুধু যে খাদ্য-অখাদ্যের ব্যবসায়ীরাই বাজার ছেয়ে আছে তা নয়, জ্ঞান-পণ্যের ও রস-পণ্যের বণিকদের কোলাহলেও বাজার সরগরম। কিছু বেচতে গেলেই খরিদ্দারদের সামর্থের দিকে নজর দিতে হয়। রুচির বেশীর ভাগটাই হচ্ছে সামর্থ। বেশীর ভাগ লোক সামর্থের অভাবে বেশী দাম দিয়ে জিনিস কিনতে পারে না তাই ব্যাপারীকে পাঁচ-মিশলি মাঝারি জিনিসই বেশী করে আনতে হয় বাজারে। রসের ক্ষেত্রেও খুব উঁচুদরের রস-সৃষ্টির জন্যে যে মূল্য দিতে হয় সে মূল্য বেশীর ভাগ লোকের অন্তরের মঞ্জুষায় সঞ্চিত নেই। তাই রস-পণ্যের যারা ব্যাপারী তারা যে খরিদ্দার বুঝে সেরা জিনিসটাতে ভেজাল মিশিয়ে মাঝারি করে বাজারে চালাতে চেষ্টা করবে এটা স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাভাবিক হলেও এটা যে দুঃখের এটা স্বীকার করতেই হবে। কেন না দেহের অন্নে ভেজাল যেমন সাংঘাতিক আঘাত হানে, মনের অন্নে কুশ্রীর ভেজাল, নিচু সুরের মিশ্রণ তার চেয়ে বেশী ছাড়া কম আঘাত হানে না।

চোদ্দ বছর হোতে চললো রবীন্দ্রনাথ আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন। এই অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর গানগুলির যে সর্বনাশ হয়েছে তা দেখলে বেদনায় মন ভারাক্রান্ত হয়। অথচ তাঁর অজস্র সৃষ্টির মধ্যে গানগুলিকেই তাঁর সেরা সৃষ্টি বলে মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর সেই সেরা সৃষ্টিতে ভেজাল মিশনোর যে আনুষঙ্গিক প্রয়াস চারদিকে দেখা যাচ্ছে তাতে ভয় হয় যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর এতো অল্প দিনের মধ্যেই যখন তাঁর গানের এই মর্মান্তিক অবস্থা, আরো কিছু বছর বাদে যাদের প্রাচুর্য ও পীড়নে তাঁর গানের সোনা হয়তো একেবারে ঢাকা পড়ে যাবে।

এই নিদারুণ অবস্থা সৃষ্টি করবার জন্যে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ কম দায়ী নন। বিশ্বভারতী থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের যে সব স্বরলিপি প্রকাশিত তাতে একটি গানের যে স্বরলিপি বের হয়েছে এক সময়ে, পরবর্তী কালে সেই একই গানের অন্য সুরের স্বরলিপি স্বরলিপির বইয়ের নতুন সংস্করণে ছাপা হয়ে বের হচ্ছে। বিশ্বভারতীর সংগীত-বিভাগের কর্তৃপক্ষদের অমার্জনীয় অপরাধের ফলে এটা

ঘটছে। এঁদের প্রত্যেকেই নিজেকে রবীন্দ্রনাথের গানগুলির একমাত্র অধিকারী প্রমাণ করবার জন্যে ও নিজের প্রাধান্য জাহির করবার জন্যে ব্যস্ত। এঁদের নিজেদের মধ্যের লড়াইটা নিছক হাস্যরসেরই উপাদান যোগাতো যদি তাঁদের আত্ম-প্রাধান্যের কলহ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে এমন করে বিকৃত না করতো। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্র-সংগীত নিয়ে তাঁদের সংগীত-বিভাগের মাতব্বরদের এই সর্বনাশী খেলা যে কি করে বরদাস্ত করেন, কেন বরদাস্ত করেন তা আমাদের ধারণার বাইরে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর থেকে এঁরা দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিগুলি আর মানতে রাজী নন। এঁদের দম্ভ ও দুঃসাহসিকতা কিছুকাল থেকে শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে। রবীন্দ্রনাথের দেওয়া অনেক গানের সুর এঁরা বিকৃত করেছেন দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বদল করে। এতো অগুনতি গান এঁদের দ্বারা ধর্ষিত হয়েছে যে তার সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া এই প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবুও যে তালিকা দিচ্ছি তার থেকেই সবাই বুঝতে পারবেন কি বেপরোয়া ভাবে রবীন্দ্র-সংগীতকে ধর্ষণ করা হচ্ছে—আর সেটা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর ছায়া-আশ্রিত লোকদের দ্বারা।

১। 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' এই গানটির স্বরলিপি ১৩৪৪ সালে দিনেন্দ্রনাথ প্রকাশ করেন 'স্বরবিতান'-এর প্রথম খণ্ডে। ১৩৫৪ সালে 'স্বরবিতান'-এর যে সংস্করণ বের হয় তাতে সুরটিকে পরিবর্তন করা হয়েছে। ১৩৫৬ সালের সংস্করণেও এই বদলানো সুরটিই বজায় রাখা হয়েছে। অশালীনতার পরাকাষ্ঠা এই যে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপির বই হিসেবে 'স্বরবিতান' এখনও প্রকাশ করা হচ্ছে!

২। 'সখি, আঁধারে একেলা ঘরে' এই গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি ১৩৪৩ সালে 'স্বরবিতান', দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫ সালের সংস্করণেও এই গানের সুরটি অবিকৃত থাকে। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপিটি অদল বদল করে দেওয়া হয়। অবিশ্যি এই ক্ষেত্রেও দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি বলে সেটা চালানো হচ্ছে।

৩। 'বন্ধু রহো রহো সাথে' গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি 'স্বরবিতান', দ্বিতীয় খণ্ডে ১৩৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে এই গানের সুরটিকে বদল করে ছাপানো হয়।

৪। 'কোথা যে উধাও হোলো' গানটির দিনেন্দ্রনাথ-কৃত স্বরলিপি ১৩৪৩ সালে 'স্বরবিতান', দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৩৫৫ সালের সংস্করণে সুরটির উলটপালট করে স্বরলিপি বের হয়। ১৩৫৯ সালের সংস্করণে রবীন্দ্রনাথের উপর অসীম করুণা দেখিয়ে, ও দিনেন্দ্রনাথের উপর কৃপা করে আবার ১৩৪৩ সালের সুরে ফিরে গেছেন এই মাতব্বরেরা।

৫। 'আমারে ডাক দিল কে' এই গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ১৩২৯ সালে 'নবগীতিকা' প্রথম খণ্ডে প্রকাশ করেন। ১৩৩৭ সালের সংস্করণেও সুরটি বিশ্বভারতীর সংগীত-বিভাগের বর্তমান অধীশ্বরদের কৃপা-দৃষ্টি লাভ করে নি। 'নবগীতিকা'-র ১৩৫৭ সালের সংস্করণে সুরটির পরিবর্তন করা হয়েছে।

৬। 'আমায় ভুলতে দিতে' গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ ১৩২৪ সালে 'গীতলেখা', প্রথম খণ্ডে

প্রকাশ করেন। ১৩৪২ সালের সংস্করণেও সুরটি অবিকৃত ছিলো। ১৩৬২ সালের সংস্করণে সুরটি বদলানো হয়েছে।

৭। 'অন্ধজনে দেহ আলো' এই গানটির স্বরলিপি দিনেন্দ্রনাথ 'বৈতালিক' স্বরলিপি-গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ১৩৩৫ সালে দ্বিতীয় সংস্করণেও সুরটি অবিকৃত ছিলো। ১৩৬২ সালের সংস্করণে দিনেন্দ্রনাথ-কৃত এই গানটির স্বরলিপির এমন পরিবর্তন করা হয়েছে যে তাঁর স্বরলিপি বাতিল করা হয়েছে বললেই সত্য বলা হবে।

৮। 'গ্রামছাড়া ঐ রাঙা মাটির পথ' গানটির স্বরলিপি সংগীতবিদ্ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। এটি ১৩১৬ সালে 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর স্বরলিপিতে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংস্করণে এই গানের সুরটির বহু পরিবর্তন করা হয়েছে। এই দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় বলা হয়েছে যে এই গানটির স্বরলিপির পরিবর্তন দিনেন্দ্রনাথ ও অচ্ছের দ্বারা কৃত। দিনেন্দ্রনাথ আজ নেই, তাই তাঁর সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তার যথার্থতা বিচার করবার উপায় নেই। কিন্তু যে 'অচ্ছ'টির কথা বলা হয়েছে, সেই 'অচ্ছ'-টি কে এবং তার কি অধিকার আছে সুর বদল করবার সেটা জানতে ইচ্ছে করে। রবীন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথের জীবিত কালে শ্রীমতী কনক দাস এই গানটির যে রেকর্ড করেছেন সেটিকে প্রামাণ্য বলে ধরা যেতে পারে। নতুন স্বরলিপির সঙ্গে তার কোনো মিল নেই।

৯। 'ওহে জীবনবল্লভ' ও 'প্রতিদিন আমি হে জীবন-স্বামী' এই দুটি গানের স্বরলিপি কাঙালীচরণ সেন কৃত 'ব্রহ্ম-সংগীত-স্বরলিপি'-তে (১৩১১-১৩১৮ সাল) প্রকাশিত হয়। ১৩৪৬ সালে 'স্বরবিতান,' চতুর্থ খণ্ডে এই দুটি গানের স্বরলিপি প্রকাশ করা হয়। কাঙালীচরণ সেনের স্বরলিপির সুর তখনও বজায় থাকে। ১৩৫৮ সালের 'স্বরবিতান'-এর সংস্করণে এই দুটি গানেরই সুর বিকৃত করা হয়েছে।

১০। 'আজি বহিছে বসন্ত,' 'মোরে বারে বারে ফিরালে,' 'অন্তরে জাগিছ অন্তর্যামী'—এই গানগুলির স্বরলিপি কাঙালীচরণ সেন প্রকাশ করেন 'ব্রহ্ম-সংগীত-স্বরলিপি'-তে। 'স্বরবিতান'-এর ১৩৫৮ ও ১৩৫৯ সালের সংস্করণে এই গানগুলির সুর বদল করা হয়।

১১। 'স্বরবিতান', প্রথম খণ্ডের মোট ৪টি সংস্করণ বেরিয়েছে। প্রথম সংস্করণে 'সে আমার গোপন কথা' গানটির অন্তরাতে 'প্রাণ আমার বাঁশী শোনে' ছিলো। দ্বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণে 'প্রাণ যে আমার বাঁশী শোনে' করা হয়। আবার নূতন সংস্করণে (১৩৬১) 'যে' কথাটা বাদ দেওয়া হয়েছে। গীতবিতানে তৃতীয় সংস্করণেও 'যে' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে।

আর কতো উদাহরণ দেবো? এরকম শত শত উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বিশ্বভারতীর সংগীত-বিভাগের কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুরগুলির বিশেষত্ব, তাদের অপূর্বত্ব, তাদের অনন্য-সাধারণ মৌলিকত্ব খুচিয়ে দেবার জন্যে মরিয়া হয়ে লেগে পড়েছেন।

গ্রামাফোন কম্পানীও তাঁদের এই সুর-দলনী লীলার অন্যতম সহায়ক। রবীন্দ্রনাথের যে সব গান রেকর্ড করবার অধিকার গ্রামাফোন কম্পানী কিঞ্চিৎ অর্থের বিনিময়ে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষদের কাছ থেকে আদায় করেন, সে অধিকার বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই স্বৈরাচারে পরিণত হয়েছে। বিকৃত

সুর ও বিকৃত উচ্চারণ রবীন্দ্র-সংগীতের বহু রেকর্ডে বিভীষিকা জাগিয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে অর্থ রোজগারের উপায় স্বরূপ ব্যবহার না করে যদি তাঁর এই মহতী সৃষ্টির সত্য রূপটিকে অবিকৃত ও অক্ষুণ্ণ অবস্থায় সকলের কাছে ধরে দেওয়া তাঁদের পরম কর্তব্য বলে মনে করতেন তাহলে গ্রামাফোন কম্পানী অকিঞ্চিৎকর অর্থ দিয়ে যে অনর্থ সৃষ্টি করে চলেছে তা কবে বন্ধ হয়ে যেতো।

রবীন্দ্র-সংগীতের সুর-বিকৃতির জন্যে আমাদের রেডিও-কর্তৃপক্ষও কম দায়ী নন। রেডিওতে রবীন্দ্রনাথের গান যাঁরা গান তাঁদের বেশীর ভাগই তাঁদের মজি মতো রবীন্দ্র-সংগীতের সুর একটু আধটু বদল করে গান। যেখানে তান আদবেই ছিলোনা সেখানে তান দিয়ে গান। এটা যে কতো বড়ো অশালীনতা তা বলে শেষ করা যায় না। স্রষ্টার সৃষ্টির উপর হাত চালাবার ও নিজের খেয়াল মতো রঙ (কাদা!) লেপবার অধিকার কারো নেই। রবীন্দ্রনাথের গান তান দিয়ে ফেনিয়ে তোলবার যে আসুরিকী লীলা সুরু হয়েছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ নিজে যা লিখেছিলেন দিলীপ রায়কে সেটিকে মানার দিক থেকে বেপরোয়া আধুনিকদের বাধা থাকলেও, জানার দিক থেকে আশা করি বাধা হবে না।

রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"তুমি কি বলতে চাও যে আমার গান যার যেমন ইচ্ছা সে তেমনি ভাবে গাইবে? আমি ত নিজের রচনাকে সে রকম ভাবে খণ্ড বিখণ্ড করতে অনুমতি দেই নি। ···যে রূপ সৃষ্টিতে বাইরের লোকের হাত চালাবার পথ আছে তার এক নিয়ম, আর যার পথ নেই তার অন্য নিয়ম। ···হিন্দুস্থানী সংগীতকার তাঁদের সুরের মধ্যকার ফাঁক গায়ক ভরিয়ে দেবে এটা যে চেয়েছিলেন। ···কিন্তু আমার গানেত আমি সে রকম ফাঁক রাখি নি যে সেটা অপরে ভরিয়ে দেওয়াতে আমি কৃতজ্ঞ হয়ে উঠব।"

এই ছোলো রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে তান দিয়ে ফেনিয়ে তোলবার যে হুড়োহুড়ি চলছে তার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের নিজের মত।

শুধু এই নয় আরও এক ধরণের ব্যভিচার সুরু হয়ে গেছে রাগ-রাগিণীর এলাকা-ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের প্রথম যুগের গানগুলিকে নিয়ে। এ পর্যায় পড়ে রবীন্দ্রনাথ-রচিত বহু ব্রহ্মসংগীত। যে হেতু এই গানগুলি রাগ-রাগিণীর সুর-লোকের বাসিন্দে কোনো কোনো সংগীতজ্ঞ তাই ধরে নিয়েছেন যে রাগের শাস্ত্রসম্মত পুরো বিস্তার করবার অধিকার তাঁদের আছে এই গানগুলিতে। বাহার রাগে বাঁধা রবীন্দ্রনাথের 'আজি বহিছে বসন্ত পবন সুমন্দ তোমারি সুগন্ধ হে' গানটি উদাহরণ স্বরূপ দেখা যাক। এই গানটি মূলত বাহার রাগে হলেও রবীন্দ্রনাথ জায়গায় জায়গায় এমন দু একটি স্বর-যোজনা করেছেন যেগুলি রাগের দিক থেকে বিচার করে দেখলে শুদ্ধ বাহার রাগে লাগে না। তার কারণ হচ্ছে এই যে রবীন্দ্রনাথ কখনো রাগ-রূপ সৃষ্টি করার কাজে লাগেন নি। তিনি সারাজীবন একটি সাধনাই করে গেছেন, আর সেটি হচ্ছে গান-সৃষ্টির সাধনা। গানের কাব্যাংশের রচনীয় ভাবটিকে অনির্বচনীয় সুরের সঙ্গে মিলিয়ে একটি গান সৃষ্টি করাই ছিলো তাঁর উদ্দেশ্য। এক কথায় কথা ও সুরের অপূর্ব মিলন ঘটিয়ে গান সৃষ্টি করাই ছিলো তাঁর সারা জীবনের সাধনা। এখন যদি কোনো

ওস্তাদ 'আজি বহিছে বসন্ত' গানটি মূলত বাহার রাগে রচিত বলে গানটিতে বাহার রাগের শুদ্ধরূপ ফুটিয়ে তোলবার কাজে কোমর বেঁধে লেগে যান তাহলে তাঁর দুঃসাহসের প্রচুর তারিফ করেও তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানগুলিকে কখনো রাগ-রাগিণীর রূপ ফোটাবার আধার হিসেবে ব্যবহার করেন নি। সুরকে তিনি ব্যবহার করেছেন শুধু গানের কথার ভাবটিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে। তাঁর গান একলা সুরের অ-দ্বৈত প্রকাশের ক্ষেত্র নয়। কথা ও সুরের দ্বৈত প্রকাশের লীলাভূমি তাঁর গান। তাই মূলত বাহার রাগের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও ভাব প্রকাশের তাগিদে তিনি বাহারের বাঁধা-ধরা স্বর-নক্সার মধ্যে অন্য স্বর অসঙ্কোচে মিশিয়েছেন। সেইখানেই তাঁর সৃষ্টির বিশেষত্ব, তাঁর স্বকীয়ত্বের প্রকাশ, তাঁর গান-সৃষ্টির অসাধারণত্ব। যে সংগীতজ্ঞেরা রবীন্দ্রনাথ-রচিত গানগুলিকে তাদের বিশেষত্ব থেকে বঞ্চিত করবেন রাগ-রাগিণীর শুদ্ধরূপ ফুটিয়ে তোলবার বাসনায়, তাঁরা রবীন্দ্র-সংগীতের বিশেষত্বটুককে লোপ করে এক অনন্যসাধারণ গান-স্রষ্টার রচিত অসাধারণ সুরগুলিকে সাধারণ করে তুলবেন। এক কথায় এই সংগীতজ্ঞেরা রবীন্দ্রনাথের গানগুলিকে শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর ভাটপাড়ার বাসিন্দে করে তাদের জাতে তুলবেন বটে কিন্তু তাদের প্রাণে মারবেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের উদ্দেশ্য ও তাঁর সুর-রচনার উদ্দেশ্য তো বার বার আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি বলছেন—"সংগীতের উদ্দেশ্য ভাব প্রকাশ করা। যেমন কেবলমাত্র ছন্দ কানে মিষ্টি শুনাক তথাপি অনাবশ্যক, ভাবের সহিত ছন্দই কবিদের ও ভাবুকদের আলোচনীয়, তেমনি কেবল মাত্র সুরসমষ্টি ভাব না থাকিলে জীবনহীন দেহমাত্র। সে-দেহের গঠন সুন্দর হইতে পারে কিন্তু তাহাতে জীবন নাই।"

তিনি বলছেন—"গায়কেরা সংগীতকে যে আসন দেন আমি সংগীতকে তদপেক্ষা উচ্চ আসন দিই। তাঁরা সংগীতকে চেতনহীন জড় সুরের উপর স্থাপন করেন, আমি তাহাকে জীবন্ত অমর ভাবের উপর স্থাপন করি। তাঁহারা গানের কথার উপর সুরকে দাঁড় করাইতে চান, আমি গানের কথাগুলি সুরের উপর দাঁড় করাইতে চাই। তাঁরা কথা বসাইয়া যান সুর বাহির করিবার জন্য, আমি সুর বসাইয়া যাই কথা বাহির করিবার জন্য।"

আর এক জায়গায় তিনি লিখছেন—"যদি মধ্যমের স্থানে পঞ্চম দিলে ভালো শুনায় আর তাহাতে বর্ণনীয় ভাবের সহায়তা করে তবে জয়জয়ন্তী বাঁচুন বা মরুন, আমি পঞ্চমকে বাহাল রাখিব না কেন?"

আর রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবন-ভোর সুর-সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই পঞ্চমকেই বাহাল রেখেছেন। রাগ-রাগিণীর কাঠামোর শুদ্ধতার ও অশুদ্ধতার বিচার নিয়ে তিনি আদবেই ব্যস্ত হন নি। যেটি বলতে চেয়েছেন সেটি ঠিকভাবে বলা হোলো কিনা, তার ভাবটিকে যতদূর সম্ভব প্রকাশ করা গেলো কি গেলো না, একমাত্র এইটেই ছিলো তাঁর দেখবার বিষয় ও ভাববার বিষয়। আজ তাই রাগ-সংগীতের পর্যায়ভুক্ত তাঁর গানগুলিকে নিয়ে যখন রবীন্দ্রনাথের সুস্পষ্ট-অভিমত-বিরুদ্ধ প্রণালীতে বিকৃত করবার অভিযান চলেছে, আর বিশ্বভারতী এই সব গানগুলির বিকৃতিকৃত সুরের স্বরলিপি

প্রকাশ করছেন, আবার এটাও শিখে দিচ্ছেন যে আগেকার সুরটাও চলুবে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের দেওয়া সুর আবার ওস্তাদের দ্বারা অধুনা বিকৃতিকৃত সুরও চলবে তখন অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে এই কথাটা বলতেই হবে যে বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-সংগীতের কল্যাণ তো করছেনই না, বরঞ্চ তার অপূরণীয় ক্ষতি করছেন। কিন্তু রবীন্দ্র সংগীতকে বিরুদ্ধবাদীদের আক্রমণের হাত থেকে বাঁচাবার দায়িত্ব তো শুধু বিশ্বভারতীর নয়, সে দায়িত্ব দেশবাসীর।

সে দায়িত্ব আমাদের পালন করতেই হবে। সেই দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালন করতে গেলে সংগীত ও সংগীতের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ ধারণাগুলি আমাদের জানা একান্ত দরকার। এখন তাই সঙ্গীত সম্বন্ধীয় তাঁর বিশেষ ধারণাগুলি ধরে দেবার চেষ্টা করবো।

তাঁর নিজের তৈরী গানের প্রকৃতি সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ যা বলেছেন সেগুলি জানা থাকলে তাঁর গানগুলিকে খেঁতলাবার যে প্রক্রিয়া অধুনা এক দল লোক চালিয়ে চলেছেন, হয়তো সেটা কিঞ্চিৎ পরিমাণে বন্ধ হবে। রবীন্দ্রনাথ বলছেন—**"আমি যে গান তৈরী করেছি তার ধারার সঙ্গে হিন্দুস্থানী সংগীতের ধারার একটা মূলগত প্রভেদ আছে।**···হিন্দুস্থানী সংগীতে সুর মুক্তপুরুষ ভাবে আপনার মহিমা প্রকাশ করে। কথাকে সরিক বলে মানতে সে নারাজ। বাংলার সুর কথাকে খোঁজে, চিরকুমার ব্রত তার নয়, সে যুগল মিলনের পক্ষপাতী।"

দিলীপ রায়কে তিনি লিখছেন—"তুমি এটা কেন মানবে না যে, হিন্দুস্থানী সংগীতের বিকাশ যে ভাবে হয়েছে আমাদের বাংলা সংগীতের ধারা সে ভাবে বিকাশ লাভ করে নি? এ দুটোর মধ্যে প্রকৃতিগত ভেদ আছে। বাংলার সংগীতের বিশেষত্ব যে কি, তার দৃষ্টান্ত আমাদের কীর্তনে পাওয়া যায়। কীর্তনে আমরা যে আনন্দ পাই সে ত অবিমিশ্রিত সংগীতের আনন্দ নয়। তার সঙ্গে কাব্য রসের আনন্দ এক হয়ে একাত্ম হয়ে মিলিত।"

এবারে তাঁর গানগুলি নিয়ে যথেচ্ছাচার করবার যে খুসমেজাজী স্বাধীনতা অনেকে নিয়ে থাকেন সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ কি বলেছেন সেটি দেখা যাক। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন—"আমার গানের বিকৃতি প্রতিদিন আমি এতো শুনেচি যে আমারও ভয় হয়েচে যে আমার গানকে তার স্বকীয় রসে প্রতিষ্ঠিত রাখা হয়ত সম্ভব হবে না।···ললিত কলার সৃষ্টির স্বকীয় বিশেষত্বের উপরেই তার রস নির্ভর করে। গানের বেলাতে তাকে রসিক হোক অরসিক হোক সকলেই আপন ইচ্ছামত উলট্-পালট্ করতে সহজে পারে বলে তার উপরে বেশী দরদ থাকা চাই। সে সম্বন্ধে ধর্ম-বুদ্ধি একেবারে খুইয়ে বসা উচিত নয়।"

আশা করা যাক যে তাঁর বেদনা-সিঞ্চিত এই কথাগুলি জানার পরে রবীন্দ্রনাথের গানগুলি নিয়ে স্বাধীনতার দোহাই দিয়ে বিকৃত করবার অপকর্ম থেকে আমরা নিবৃত্ত হবো।

সংগীতের একটি প্রধান অঙ্গ হচ্ছে তাল। কিন্তু এই তাল নিয়ে তাল ঠোকাঠুকি, গানের প্রাণকে তালের গদাঘাতে হত্যা করবার যে বীভৎস কাণ্ড ওস্তাদী গানের আসরে প্রায়ই চোখে পড়ে সে যে সূক্ষ্মতম রসবোধের অধিকারী রবীন্দ্রনাথকে মর্মান্তিক পীড়া দেবে এটা অতি সহজেই ধারণা করা যায়। তাল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"তাল জিনিসটা সংগীতের হিসাব-বিভাগ। এর

দরকার খুবই বেশী, সে কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু দরকারের চেয়েও কড়াকড়িটা যখন বড়ো হয় তখন দরকারটাই মাটি হতে থাকে।···সঙ্গীতের একটা প্রধান অঙ্গ তাল। আমাদের আসরে সব চেয়ে বড়ো দাঙ্গা এই তাল নিয়ে। গান বাজনার ঘোড়দৌড়ে গান জেতে কি তাল জেতে এই নিয়ে বিষম মাতামাতি। দেবতা যখন সজাগ না থাকেন তখন অপদেবতার উৎপাত এমনি করেই বেড়ে ওঠে। স্বয়ং সংগীত যখন পরবশ, তখন তাল বলে আমাকে দেখো, সুর বলে আমাকে।"

নিছক কৌশল-জানা ওস্তাদদের হাতে পড়ে গান যে সুর ও তালের কসরৎ দেখানোর সামগ্রী হয়ে দাঁড়িয়েছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"লাঠিয়ালের হাতে রাজদণ্ড দিলেও সে তা নিয়ে লাঠিয়ালি করতে চায়, কেন না রাজত্ব করা তার প্রকৃতিগত নয়। তাই ওস্তাদের হাতে সংগীত সুরতালের কৌশল হয়ে ওঠে। এই কৌশলই কলার শত্রু। কেন না কলার বিকাশ সামঞ্জস্যে, কৌশলের বিকাশ দ্বন্দ্বে।"

তিনি বলছেন—"রসবোধের নাড়ী যখন ক্ষীণ হয়ে আসে কৌশল তখন কলাকে ছাড়িয়ে যায়। ···এ দেশে গানের যখন ভরা যৌবন ছিল তখন এমন সব ওস্তাদ নিশ্চয়ই সর্বদা মিলতো, গান গাওয়াই যাঁদের স্বভাব, গানের পালোয়ানি করা যাঁদের ব্যবসা নয়। বুলবুলি তখন গানেরই খ্যাতি পেতো, লড়াইয়ের নয়।"

সব সৃষ্টির মতো গানও সংস্কারের শিকল পরে অচল হয়ে থাকতে পারে না। সংস্কার-বদ্ধ সৃজনী-শক্তিহীন ওস্তাদেরা তাঁদের অভ্যস্ত সংস্কারের বাইরের সব কিছুকে সন্দেহের চোখে, ভয়ের চোখে, এমন কি বিদ্বেষের চোখে দেখেন। তবুও নতুন সৃষ্টি হবে, মানুষ সংস্কারের পাষাণ সরিয়ে সৃষ্টির স্বরূপকে বারে বারে মুক্তি দেবে। গানের বেলাও সেই একই কথা। সংস্কারের এই অত্যাচার সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলছেন—"স্বরস্বতীকে শিকল পরালে চলবে না, সে শিকল তাঁরই নিজের বীণার তারে তৈরী হলেও নয়। ···দস্তুর বুড়োটা নবীন প্রাণের খেয়াল সইতে পারে না। শাসনকে সে বড়ো বলে জানে প্রাণকে নয়।"

কিছু লোকের ধারণা যে আমাদের ভারতীয় সংগীত উৎকর্ষের এমন চূড়ায় পৌঁছে গেছে যার পরে আর কোনো শিখর তার চড়বার কিম্বা দখল করবার নেই। সৃষ্টিশক্তিতে দেউলে এই ভীরুদের রবীন্দ্রনাথের এই কথাগুলি স্মরণ করিয়ে দিই। তিনি বলছেন—"মহাদেব, নারদ এবং ভরত মুনিতে মিলে পরামর্শ করে যদি আমাদের সংগীতকে এমন চূড়ান্ত উৎকর্ষ দিয়ে থাকেন যে আমরা তাকে কেবলমাত্র মানতেই পারি, সৃষ্টি করতে না পারি তবে এই সুসম্পূর্ণতার দ্বারাই সংগীতের প্রধান উদ্দেশ্য নষ্ট হয়েছে বলতে হবে।"

তাঁর এই সত্যবাণীও স্মরণ রাখা দরকার যে "মানুষ কেবল স্থাবর ভাবে ভোগ করে না, সচল ভাবে সৃষ্টি করে।"

শিল্পদৃষ্টি

নারায়ণ চৌধুরী

'সাহিত্যসেবী' কথাটাকে আজকাল আমরা অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করে থাকি। যিনিই কিছু-না-কিছু, কোন-না-কোন প্রকারের রচনার অভ্যাস করে থাকেন তিনিই 'সাহিত্যিক' আখ্যায় আখ্যাত হন। কিন্তু 'সাহিত্যিক' কিংবা 'সাহিত্যসেবী' কথা দুটির এমন ব্যাপক প্রয়োগ হওয়া উচিত কি না সেটি ভেবে দেখা দরকার। সাহিত্যিক কথাটির সংজ্ঞার্থের এইরূপ উদার বিস্তৃতীকরণের ফলে সাধারণের মনে একটা ধারণা হয়েছে যে সাহিত্যসেবায় সাফল্যের জন্য বিশেষ আয়াস-প্রয়াস স্বীকারের প্রয়োজন নাই, যা-কিছু সংরচন করা যায় তা-ই অবলীলাক্রমে সাহিত্য-পদবাচ্য হয়ে ওঠে। সাহিত্য যেন স্থিতিস্থাপক গুণবিশিষ্ট একটি মেরুদণ্ডহীন জিনিস, ইচ্ছা করলে তাকে টেনে বাড়ানো যায়, ইচ্ছা করলে তার পরিধি নিতান্ত সংকুচিত করেও আনা চলে। যে কোন রকমের বিষয় যে কোন রকমের ভাষায় লিপিবদ্ধ করলেই তা সাহিত্য হল, যেন সাহিত্যের জন্য বিশেষ শিক্ষা, বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, বিশেষ ধরনের অনুশীলনের প্রয়োজন নেই। সব রকম কাজেরই বিশিষ্ট পদ্ধতি-প্রকরণ আছে, আবশ্যিক প্রস্তুতির অধ্যায় আছে, নানাবিধ ক্লেশ ও ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন আছে; কেবল সাহিত্যের বেলাতেই ও-সকল অনাবশ্যক, অবান্তর। সাহিত্যানুশীলনের সম্পর্কে লেখকদের মধ্যে এ জাতীয় শিথিল মনোভাব গড়ে ওঠার ফলে কী সাংঘাতিক অনাচার প্রশ্রয় পাচ্ছে তা সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের বিপুল সৃষ্টি-প্রাচুর্যের দিকে এক-নজর তাকালেই বোঝা যাবে বলে মনে করি।

একটি কথা গোড়াতেই অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলে নেওয়া দরকার। সেটি হচ্ছে এই, সাহিত্যে ও সাংবাদিকতায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। আজকাল সাহিত্যের নামে যে সকল রচনা প্রকাশিত হচ্ছে তার অধিকাংশ হচ্ছে সাংবাদিকতাধর্মী। সংবাদপত্রের তথাকথিত সাহিত্য-প্রয়াসকে আজ উচ্চ ঢক্কানিনাদের সাহায্যে আসল সাহিত্য বলে চালাবার একটা সজ্ঞান চেষ্টা চলছে। শুধু যে 'রম্যরচনা' নামধেয় তুচ্ছ চটুল রচনাগুলিই সাংবাদিকতার পর্যায়ে পড়ে তা-ই নয়, অনেক গল্প-উপন্যাসও আসলে সৃষ্টিধর্মী রচনার ছদ্ম আবরণে সাংবাদিকতার কুললক্ষণই স্বীয় অঙ্গে ধারণ করে চলেছে। সংবাদপত্রের রিপোর্টার রসকষবর্জিত তথ্যের পর তথ্য সাজিয়ে নিতান্ত যান্ত্রিক ভাষায় যে ধরনের 'কাহিনী' ('story') পাঠক-সাধারণ্যে পরিবেশন করেন, আজকালকার একাধিক গল্প-উপন্যাস লেখকের লিখবার ধরন অনেকটা তা-ই। এ ধারার রচনারীতির প্রথম পাঠ গ্রহণ করা হয় ইয়াঙ্কি সাহিত্য থেকে, তারপর একটানা এই রীতির অনুশীলন চলছে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদক (রিপোর্টার) সুলভ রচনা-পদ্ধতির সঙ্গে ইয়াঙ্কী আধুনিক উপন্যাসের শিল্পাদর্শের প্রভাব মিশে

আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের একাংশকে আজ নিতান্ত নীরস যান্ত্রিক রচনাতৎপরতায় পরিণত করে তুলেছে।

আমরা এযাবৎ শুনে এসেছি যে বাক্য রসাত্মক না হলে তা সাহিত্যপদবাচ্য হয় না। আরও শুনে এসেছি সাহিত্যের ধর্মই হচ্ছে এই যে তা হৃদয়সংবেদনবেদ্য মনোভাবের প্রকাশক। স্বীয় অনুভূতির রঙরস যদি অপরের মনে সঞ্চারিত না করা যায়, তবে সাহিত্য আখ্যাযুক্ত ভাষারীতির সার্থকতা প্রতিপাদিত হয় না। অধুনা এই বহুমান্য পুরাতন সাহিত্যিক সংস্কারের ভরাডুবি হতে বসেছে। দৈনিক সংবাদপত্রের প্রভাবে ও প্রশ্রয়ে পুষ্ট কথাসাহিত্যিকের দল জেনেশুনে সবাই রিপোর্টারদের খাতায় নাম লিখিয়েছেন। তাঁদের রচনারীতির ভিতর ব্যঞ্জনাগুণের পরিচয় খুব অল্পই অভিব্যক্ত। কথা সাজিয়ে সাজিয়ে তাঁরা কথার পাহাড় গড়ে তোলেন, কিন্তু শিল্পসৌধ নির্মিতির কৌশল ও গুণপনা তাঁদের হাতের কাজে মোটেই ধরা পড়ে না। কথাসাহিত্য আসলে কথা সাজাবারই খেলা। আজকের দিনের সংবাদপত্র-ঘেঁষা কথাসাহিত্যের ভিতর খেলার মনোভাব সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অর্থাৎ সাহিত্যে শিল্পের লীলা অপ্রকট, রচনার ঘর্মনিস্যন্দী অধ্যবসায়ী সংস্কারটাই সেখানে বলবৎ। সংবাদপত্রের বিরাট হাঁ-করা স্তম্ভপূরণের জন্য সব চাইতে যেটা বেশী দরকার তা হচ্ছে রচনার প্রাচুর্য। সংবাদপত্রের চরিত্রটাই এমন যে সেখানে গুণের চাইতে পরিমাণ স্বতই সমধিক আদৃত। সংবাদপত্র-লেখকের যোগ্যতার বিচার গুণের মাপকাঠিতে যত-না হয় পরিমাণের মাপকাঠিতে তার চাইতে অনেক বেশী হয়। সংবাদপত্রের এই প্রাচুর্যের উৎকর্ষের সংস্কার অজ্ঞাতসারে আজকাল লেখকদেরও অনেকখানি পরিমাণে প্রভাবিত করেছে। ফলে যাঁরা স্বভাবত কম লেখেন অথচ ভালো লেখেন তাঁদের পক্ষে এই ডামাডোলের বাজারে অল্প বা বিনা আয়াসে পাতার পর পাতা ভরিয়ে তোলার ক্ষমতাযুক্ত লেখকদের সঙ্গে এঁটে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদিও রসিক পাঠকমাত্রই স্বীকার করবেন, মুষ্টিমেয় সংখ্যক ভালো লেখকের সঙ্গে ওই-সব বাজার-চলতি লিখন-ব্যবসায়ীদের গুণের কোন তুলনাই চলতে পারে না। গুণগত উৎকর্ষ স্বল্পপরিমাণে হলেও বন্দনীয়, কতকগুলি আবর্জনার জঞ্জাল দিয়ে সাহিত্যের আঙিনা ভরিয়ে তোলার আদৌ কোন সার্থকতা দেখা যায় না।

আজকাল 'সৎ সাহিত্যিক' বলে একটা কথার উদ্ভব হয়েছে? সাহিত্যিকের সততার প্রমাণ কী? শুধুমাত্র কথার পর কথা গেঁথে রচনার ভিতর গল্প-উপন্যাসের আদল আনতে পারাটাই কি সাহিত্যিক সততার নিশানা? দুর্বোধ্য শব্দসমষ্টি ও ভাঙাচোরা ছন্দের সাহায্যে পর পর বিন্যস্ত কতিপয় পংক্তিকে কবিতার চেহারা দিতে পারাটাই কি কাব্যিক সততার লক্ষণ? আমার মনে হয় সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আমাদের একালীন লেখকদের মধ্যে একটা বড় রকমের প্রমাদ আছে, সেটি অবিলম্বে দূর হওয়া দরকার। এ কথা প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষণা করা প্রয়োজন, নিছক ভাষার উপর দখল আয়ত্ত হলেই লেখক হওয়া যায় না। লেখক হতে গেলে আরও কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত গুণপনার দরকার। সেই অতিরিক্ত গুণপনার মধ্যে পড়ে জীবনবোধের গভীরতা, সহজাত চিন্তাশীলতা এবং জীবন, জগৎ ও মানুষকে বিচার করবার স্বকীয় বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী। অর্থাৎ লেখকমাত্রেরই মৌলিক

কিছু বৈশিষ্ট্য থাকা চাই। শুধুমাত্র লিপিকুশলতাটাই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়। সাহিত্যকর্মে সিদ্ধিকাম লেখকমাত্রেরই ভাষাকুশল হতে হবে তাতে সন্দেহ কী; কিন্তু প্রমাদী ধারণার ফলে এই বিশেষ ধরনের নৈপুণ্যের উপরই যদি সবটুকু জোর পড়তে থাকে, তা হলে লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার পদে পদে সম্ভাবনা। লিপিকুশলতা লেখকজীবনে সাফল্যলাভের অন্যতম শর্ত মাত্র, কিন্তু একমাত্র শর্ত নয়। বোধহয় খতিয়ে দেখলে এই শর্তটিকে অগ্রপ্রাধান্যও দেওয়া চলে না। লেখক হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভের পক্ষে সব চাইতে যা বেশী দরকার তা হচ্ছে দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্যতা। এই অনন্যতার জন্যই কেউ লেখক হন, কেউ হন না। লেখকের চিন্তায় ও কল্পনায় কিঞ্চিৎ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় না পেলে কাউকে লেখকের মর্যাদা দিতে পাঠকদের ভিতরকার সমালোচক-সত্তা স্বতই কুণ্ঠিত হয়। বহু লিখনপ্রয়াসীকে জানি যাঁদের ভাষা ঝরঝরে ও জোরালো, গল্প বানাবার সহজ ক্ষমতাও মোটামুটি তাঁদের আছে, তবু লেখকরূপে পাঠকমনের উপর তাঁরা কোনরকম দাগ ফেলতে পারেন না। এর কারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তায় বৈশিষ্ট্যের অভাব। কথার পর কথা গেঁথে রচনার প্রাকার দাঁড় করানোর বিদ্যা তাঁরা বিধিমতে আয়ত্ত করলেও এক ধরনের মৌল মৌলিকতার অভাবে তাঁদের সকল সাহিত্য-প্রয়াসই শেষ অবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। লেখকদের ভিতর কে কোন্ দরের শিল্পী তা তাঁর জীবনবোধের গভীরতার তারতম্যের দ্বারা মূলত নির্ণীত হয়। সাহিত্যবিচারের এই মুখ্য মানদণ্ডের দাবি বিস্মৃত হয়ে আমরা যদি অপ্রধানকে প্রধানের মর্যাদা দিয়ে বসি, তা হলে প্রকৃত শিল্পোৎকর্ষের লক্ষ্যে কোন সময়েই বোধ হয় আমাদের পক্ষে পৌঁছনো সম্ভব হবে না।

আজকাল আর-একটি ভ্রান্তির প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে। সেটি হচ্ছে সাংসারিক বাস্তবের সঙ্গে সাহিত্যিক রিয়ালিজম্-এর সমীকরণ। অর্থাৎ সংসার জীবনে যা ঘটে সাহিত্যে হুবহু তার প্রতিচিত্র অঙ্কন করাটাকেই ভুল করে রিয়ালিজম্ আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু সাংসারিক বাস্তব আর সাহিত্যিক বাস্তব এক বস্তু নয়। সংসারের বাস্তব ঘটনার চিত্রণ সাহিত্যে যথাযথ প্রতিফলিত হলে তা বড় জোর সুন্দর ফোটোগ্রাফী হয়, তার বেশী কিছু হয় না। সাহিত্যের পাতায় বিম্বিত যে-কোন বাস্তব চিত্রণের পশ্চাতে লেখকের নিজস্ব চিন্তার পোষকতা থাকা চাই। নচেৎ তা যথার্থ রিয়ালিজম-পদবাচ্য হয় না। বাস্তবানভূতির সঙ্গে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর যোগ হলে তবেই শুধু তার ভিতর সাহিত্যের মৌলিক লক্ষণ ফুটে ওঠে, তার আগে নয়। শরৎচন্দ্রের সাহিত্যকে অনেকে রিয়ালিষ্ট সাহিত্য বলে অভিহিত করে থাকেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এখনকার বাজার-চলতি রিয়ালিজমের থেকে সে রিয়ালিজম্এর ধারাধরন কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র। শরৎচন্দ্র পল্লীর চিত্রচরিত্র নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করেছেন বটে, তবে তার প্রক্রিয়ার সঙ্গে প্রতিলিপি চিত্রকরের পদ্ধতিপ্রকরণের বেশ কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে। শরৎচন্দ্র তৎকৃত পল্লীচিত্রগুলির বাস্তবানুগ বর্ণসমাবেশের মধ্যে নিজস্ব মনের রঙও অনেকখানি মিশিয়েছেন। এই মনের রঙটুকুরই অপর নাম হল শিল্পদৃষ্টি, যা সকলের থাকে না। আজকালকার অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসই বাস্তবানুসারী বর্ণনার ক্লান্তিকর আতিশয্যের দ্বারা ভারাক্রান্ত। তাদের মধ্যে ব্যঞ্জনাগুণের অভাব, সাহিত্যিক সুষমার অভাব। প্রতিলিপি ও শিল্পগুণান্বিত লিপির মধ্যে যে অনেকখানি তফাৎ এ সত্য বেশীর

ভাগ বাস্তবধর্মী লেখক স্বীকার করেন বলে মনে হয় না। তাঁরা বাস্তবের নকলনবিশিতেই খুসি, রসের চর্চায় তাঁদের মন নেই। ফলে অধিকাংশ লেখাই কেমন জোলো ও একঘেয়ে ঠেকে, সমস্ত মনোযোগসংহত করে আধুনিক লেখকদের রচনাপাঠের উদ্যম মনের ভিতর কদাপি জাগ্রত হয়। এটি যে আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যের একটি মূলগত ত্রুটি সে কথা স্বীকার করা ভালো।

নিবন্ধের সূচনায় আমি সংবাদপত্র-ঘেঁষা লেখকদের কথা বলেছি। ব্যঞ্জনাগুণবিরহিত প্রতিবেদকসুলভ আলোকচিত্রধর্মী রচনারীতির দোষে এঁরাই যে শুধু দোষী তাই নয়, উগ্র বামপন্থী রাজনীতি-আশ্রয়ী দলীয় লেখকেরাও এ ব্যাপারে বড় কম যান না। তাঁদের লেখায় বাস্তবের খুঁটিনাটি বর্ণনার মাত্রাতিরিক্ত আধিক্য। কম্যুনিষ্টপন্থী লেখকগণ জাঁক করেন যে, তাঁরা সমাজ-ভাবনানিরপেক্ষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যিকদের মত মনের খুঁটিনাটি বৃত্তান্তের অন্তহীন বর্ণনায় সময় নষ্ট করেন না, ক্যাপিটালিষ্ট সমাজের বৃক্ষচূড়ায় সমাসীন ক্রৌঞ্চমিথুনসদৃশ নায়কনায়িকার অসার প্রেমবিলাসের ছবি আঁকাকে তাঁরা জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার তুল্য অপরাধ বলে মনে করেন। কিন্তু কথা হচ্ছে, মনস্তাত্ত্বিক আলো-আঁধারির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ কিংবা পরগাছা সমাজের নায়ক-নায়িকার ফাঁপা প্রেমবিলাসের ছবি আঁকা যদি দোষের হয়, তবে কুলিমজুরের বস্তির সাহিত্য সৌন্দর্যহীন খুঁটিনাটি বর্ণনাই বা দোষের নয় কেন। সাহিত্যে যে যাই পরিবেশন করুন, তা সর্বাগ্রে সাহিত্যের নিজস্ব শিল্পোৎকর্ষের মানদণ্ড-উত্তীর্ণ হওয়া চাই, তারপর আর সব বিচার। আসলেই যদি গলদ থেকে গেল, তবে নির্যাতিত শোষিতের অনুকূলে পাতার পর পাতা নিখুঁত বাস্তবচিত্রণের কতটুকুই বা সার্থকতা। সাহিত্য জীবনের ডকুমেণ্টারি দলিল নয় যে তাতে জীবনের প্রতিটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ আঁকিবুঁকির ছাপ না হলেই নয়। সাহিত্যের কাজ স্বতন্ত্র। কিছু বলা এবং কিছু না-বলায় মিশে বাণীর যে ব্যঞ্জনান্বিত মধুর রূপ, সেই রূপেরই সাধক হল সাহিত্য। সাহিত্য রসের এলাকা—এই এলাকায় অতিরঞ্জনের স্থান থাকলেও অতিকথনের স্থান নেই। অনেকখানি বর্জন করে কিছুপরিমাণ গ্রহণের মধ্যে রচনার যে সুস্মিতসুন্দর মনোময় রূপটি লুকায়িত আছে, অতি বড় জনকল্যাণকামী সাহিত্যের পক্ষেও সেই আদর্শ সমান গ্রাহ্য। সাহিত্যকর্ম প্রকাশ্যত মানবতন্ত্রী কিংবা গণতান্ত্রিক অভীপ্সাযুক্ত হলেই তার গোত্রবদল হয়ে যায় না। সাহিত্যের যেটি নিজস্ব রীতি, অভিজাত মধ্যবিত্ত জনমুখী ইত্যাদি বিচার নিরপেক্ষ ভাবে সকলপ্রকারের সাহিত্যকর্মে সেই রীতি সর্বথা মান্য।

রচনার উপসংহারে আমরা আমাদের মূল প্রতিপাদ্যটিকে পুনরায় বিবৃত করি। শুধুমাত্র লিপিকুশলতা অর্জন করলেই সাহিত্যিক হওয়া যায় না, সাহিত্যকর্মীর পক্ষে সর্বপ্রধান অনুশীলনের বিষয় হচ্ছে শিল্পী মেজাজ, শিল্পবোধ। সকলের মধ্যে এই বোধ সমান থাকে না। আর যদি বা থাকে, তাকে সযত্ন অনুশীলনের দ্বারা পরিবর্ধিত করবার প্রয়োজন হয়। শিল্পভাবনায় যাঁরা দিবারাত্র মগ্ন হয়ে অছেন তাঁরা ওই মগ্নতার দ্বারাই তাঁদের শিল্পমেজাজটিকে আরও বেশী করে ফুটিয়ে তোলেন। কথায় আছে 'গাইতে গাইতে গায়েন, বাজাতে বাজাতে বায়েন।' যে সব ব্যক্তির ভিতর আপাতদৃষ্টিতে শিল্পবোধ যথেষ্ট প্রখর নয় বলে মনে হয় তাঁরাও শিল্প সাহিত্যের প্রতি

শ্রদ্ধাশীল মনোভাবপ্রসূত অমিত অধ্যবসায়ের দ্বারা যথার্থ শিল্পবুদ্ধির অধিকারী হতে পারেন। বাক্যের ব্যঞ্জনাঘন প্রয়োগ-নৈপুণ্য, মনোগত ভাবের অভিব্যক্তিদান কালে কতটুকু রেখে কতটুকু বর্জন করতে হবে সেই জ্ঞান, রসবুদ্ধি—এসব বৈশিষ্ট্য সহজাত মনে করবার কারণ নেই। অনুশীলনের দ্বারা সবকিছুই আয়ত্ত করা যায়। এমন কি কল্পনাশক্তিও। মানুষের ভিতর ব্যক্তিত্বের বিকাশের সম্ভাবনা অপরিমিত। সাহিত্যকর্মের বেলায় আমরা বেশীর ভাগ লেখক মোটামুটি লিপিকুশলতা আয়ত্ত করেই যে থেমে থাকি সে আমরা অল্পে তুষ্ট বলে। শিল্পজ্ঞান তথা রসবুদ্ধি আয়ত্তকরণের সাধনায় আত্মনিয়োগ করলে দেখা যাবে যে, এ সাধনার পথ বহুদূরবিস্তারী, তার শেষ দেখা যায় না। লিখতে লিখতেই কল্পনাশক্তির উন্মেষ হয়, রসজ্ঞান পাকা হয়। ভাষায় ব্যঞ্জনাগুণ যাঁদের সহজে আসে না তাঁদের অনলস শ্রমে নিয়ন্ত্রিত হতে বলি—চিন্তায় কর্মে রচনাতৎপরতায় অনলস শ্রমশীলতা। ধীরে ধীরে তাঁদের রচনারীতির ভিতর ব্যঞ্জনাগুণের উদ্ভব হবে। ভাষার বাহুল্য রূপ ঝরে গিয়ে কাব্যস্মিত রূপ পরিস্ফুট হয়ে উঠবে। ভাবের ভিতর আসবে পারিপাট্য, যুক্তিশৃঙ্খলা, সুমিতি। এবং যা সবচেয়ে বড় কথা তাঁদের জীবন ও জগৎকে দেখবার ভঙ্গীর মধ্যে প্রকৃত শিল্পদৃষ্টির পরিস্ফুরণ ঘটবে। কোন লেখকের জীবনে এরূপ অবস্থা এলে তিনি আর নিছক ঘটনার কপিবুক মার্কা প্রতিলিপি-চিত্রণে সন্তুষ্ট থাকেন না, প্রকাশের ভিন্নতর পথ অনুসন্ধান করেন। অন্তপক্ষে বক্তব্য-বিষয়ের মহিমাই তখন রীতির সম্যক্ সৌকর্যবিধানেও সমান তৎপর হন। কী বলব এবং কেমন করে বলব—এই দুই দাবীর ভিতর অচ্ছেদ্য সামঞ্জস্য সাধিত হলে তবেই শুধু শিল্পকর্মের চূড়ান্ত সার্থকতা।

তুমি এলে

বিভূতি ভট্টাচার্য

সেও এক পাখী-ডাকা মিষ্টি সকাল ;
আকাশের নীল পেয়ালায়
রঙীন আবীর মাখা রোদ
ঝিমোয়, ঘুমোয়, উথলায়,
ঝরে পড়ে এ মাটীর সবুজ থালায়।

সময়ের ঝর্ণা পেরিয়ে,
নদীর মেয়ের মত
আলতো নরম পায় এগিয়ে এগিয়ে
তুমি তো তখন এলে ;
দুহাতে সবুজ বন ঠেলে।

বাতাসে কি বাজলো সেতার,
এলোমেলো তোমার কথায়,
মিষ্টি আওয়াজ কানে এলো,
নরম পশম যেন
শীত শীত মন ছুঁয়ে গেলো।

এলে তুমি
বাজিয়ে স্নেহের ঝুম ঝুমি,
থমকে দাঁড়ালে পাশে এসে,
সূর্যমুখীর হাসি হেসে।

মধুমাখা দিনের আশ্বাস,
এনে দিল সেদিন আকাশ,

সমস্ত অন্তরে দিল দোল ;
প্রেমের কাজল,
দুটি চোখে মেখে নিতে নিতে,
জ্যোতির্ময়ী মণির মতন
পেলাম তোমাকে খুঁজে
মাটীর খনিতে।

শ্রাবণ-সম্ভবা

বেণু দত্ত রায়

এ-কলমুখর শাওনে তোমাকে চাই
ঝিরি ঝিরি ঝিরি বাদলের গানে
মুগ্ধ-চপলা মেয়ে গো !
হে নীল-নয়না তরুণী তন্বী; এ কালো আকাশ ছেয়ে গো
নামো রিম্‌ঝিম্ বর্ষার গানে
নৃত্য-মাতাল সারেঙীর সুরে, সেতারের গানে—
রিম্ ঝিম্ ঝিম্
এসো উদ্বেল সীমাহীন ভালোবাসাতে
তৃষিত দগ্ধ এ-মরু হৃদয় পথ চেয়ে জাগে আশাতে।

কত ফাগুনেই চেয়েছি তোমাকে পলাশে জ্বল্‌তে-জ্বল্‌তে
চেয়েছি তোমার মিঠে হাতখানি ধরতে
অশোকের লাল যৌবন-মোহে সোনালী-অধর প্রান্তে
বেঠিকানা আমি চেয়েছি তোমাকে জানতে,
তবু কই এলে, কই আর এলে বলনা—
সারা আকাশেই মুগ্ধ-মোহের ছলনা।

এ-কলমুখর শাওনে তোমাকে চাই—
এ-কলমুখর শাওনে তোমাকে প্রাণে পেতে চায় প্রাণ যে !
এসো উন্মনা, আনো উচ্ছল গান-কে ;
কলগুঞ্জন তোলো উত্তাল সেতারে—
স্বপ্ন-কলিতে নিমগ্ন করো ভাষারে,
শ্যামল শান্তি তুমি নিয়ে এসো নীল-নয়নের আলোকে—
কাজলে মুছাও গ্রীষ্মদিনের ধূসরতা এক পলকে ;

পরো কণ্ঠের মেঘের মাণিকে বিদ্যুতে-জ্বলা কী মণিহার !
কালো চঞ্চল বেণীতে দুলাও, রক্তেও তোলো ঝনৎকার।

হে নীল-নয়না শাওন-কন্যে, জল ভরো-ভরো তোমার চোখ
নিমগ্ন করো, ঢেকে দাও ধারা-বর্ষণে মূঢ় হৃদয়-লোক !
এ মরুতৃষিত দগ্ধ-দহনে অন্তর-তল তোমাকে চায়
এসো যৌবনা, নীল-অঞ্জনা নামো ধূলিতলে ধূসরতায়।

ময়দানের সংলাপ

অশ্রুকুমার সিকদার

ময়দানে এসে দাঁড়ালে যেই
কী কথা বলবে পেলে না খেই
এলো এলোমেলো দিঘিদিকের হাওয়া ;
শুধু চুপি চুপি বললে 'এই'
আর কোন কথা বলতে নেই,
আর যা বলবে সব শুনে নেবে হাওয়া ॥

ভোর হবে

কবিরুল ইসলাম

ভোর হবে ভোর হবে
কান্না ঝরানো উতল শ্রাবণ শেষে
রৌদ্রের কলি ফুল হবে হবে শরতে স্বচ্ছাকাশে
শুভ্র শিউলি গন্ধ ঝরাবে মিল মোহনায় এসে
ভোরের বৃন্তে আলোর বিকচ কমল কলিরা হাসে
শিশির কণার স্বর্ণাভ চোখে সচকিত পল্লবে
ভোর হবে ভোর হবে।

ভোর হবে ভোর হবে
হাওয়া কাকলির মধু মর্মরে মন-মালঞ্চে শুনি
রাত্রিশেষের আকাশের নীড়ে নিরালা তারারও স্বরে!
শীতান্তে এলো বকুলগন্ধ মধুঋতু ফাল্গুনী
কুঁড়ির কান্না সফল হয়েছে ফুলের সুরেলা ভোরে
(কি আশ্চর্য!) নির্জন সৌরভে,
ভোর হবে ভোর হবে।

ভোর হবে ভোর হবে
বৃষ্টির পরে কালো এলো চুলে ভিজে বনপথ ধরে
তুমি এলে ভীরু ঢেউএর মতোন আকাশে দুচোখ থুয়ে
সুরের নরম প্রজাপতি, আহা, পাখায় কী গান ঝরে
বনবেতসের মতোন স্মৃতির হাওয়ার গন্ধে নুয়ে
হৃদয়ের নীল নভে
ভোর হবে ভোর হবে॥

বাতাসের স্বর

নিকোলাউস লেনাও

কালো অরণ্য অতল গভীর নিদ্রাতে নিমগন।
অলস বাতাস পারে না দুয়াতে একটিও পল্লবে,
পারে না বহিতে ফুল-সৌরভ অলস প্রভঞ্জন,
তরুশাখে পাখী সায়রে দাদুরী স্তব্ধ নীরব সবে।

শুধু স্বপনের ফুলকির মতো জোনাকিরা দলে দল,
ঘুমের মধ্যে উঠিছে পড়িছে জ্বলিছে নিবিছে আসি,
বিরামবিহীন নৃত্যের মতো মিষ্টি স্বপনরাশি
আমার মৌন-মাতাল হৃদয়ে করিতেছে কোলাহল।

মর্মরি' উঠে সহসা তরুরা কালো বনানীর মাঝে
স্বপ্ন হইতে জাগিতে আমারে তরুদের ডাক বাজে,
জানি না কেমনে শুনিতে পাইনু সেই ডাক বারে বারে।

বাতাসের ডাক শুনিয়া হৃদয় ভয়ে কম্পিত হয়,
সেই মতো যথা পিতার বাক্য সন্তানে মেনে লয়,
যে পিতা ডাকিছে খেলা-সারা করে গৃহে ফিরিবারে তারে॥

অষ্ট্রিয় কবিতা। জর্মাণ থেকে অনুবাদ: সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

পশ্চাদভূমি

মৃগাঙ্কনাথ ঘোষ

"লিতু, এই লিতু ; দোকান খুল্ বে, খুল্—ত্থাখ দিন্, তু কেমন ধারা লোক ? খুল্ নারে এট্টু ধ্যান্!"—মুদির দোকানের ঝাঁপে ঘন ঘন ধাক্কা পড়তে লাগলো।

ভিতর থেকে নিতাই হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "এত রাত্তিরে কে রে সব ? সওদা কিনবিতো হাটে গেলছিস্ না ক্যানে ?—উঃ যা জার।" ধুঁকতে ধুঁকতে নিতাই সাফ জবাব দিল সে এই শীতের রাতে দোকান খুলতে পারবে না, মরে গেলেও না—হাজার টাকা দিলেও না।

ওপাশ থেকে ক্রেতার দল প্রথমে হুকুমের সুরে বলে উঠলো, "হাজার টাকা দেখেছিস কখনো ? দোকান তুকে খুলতেই হবে।" তারপর অবশ্য তারা সুর নামিয়ে অনুনয় করে উঠলো, "খুল্‌রে ভাই ; ব্যাগার্তা করি, কাল যে হরত্তাল ; গাঁহাক খরিদ্দার লক্ষ্মী, ফিরাতে নাই।"

"হত্তাল !" দোকানের ঝাঁপ খুলে একটা কাঁথা গায়ে দিয়ে নিতাই বাইরে চলে এলো। "কে বুল্লো হত্তাল ?"

"তাইতো শুনুহু। পিত্তয় না হয় শুধায় ত্থাখ না ক্যান হরিকে। আমাকে আধপুয়া ত্যাল দে আর এক ছটাক করকচ লবন্।"

"বাঁকি দিতে লারি।"

"তু লগদাই লেনা।"

"কিরে যদু, হত্তাল শুনুহু যে ; ঠিকতো ?"

"ঠিক হবে না ক্যানে ? এই যে পইড্যা ত্থাখ।" যদু কাপড়ের খুঁট থেকে একটা ছাপানো কাগজ বের করে দিল।

সতু গোয়ালা উত্তর করলো, "চোখ থাকতেও আঁধার রে ভাই। আড়াই কুড়ি বয়েস হলো তবুও কোনডা 'অ' তাই জানলাম না। কাগজে কি আছে তুই এখন বল।"

যদু নিজেও যে সব অক্ষর চিনে পড়তে পারে তাও নয় ; তবু সে সহরে শোনা কথার পুনরাবৃত্তি করে জানালো—বড় জেলখানায় স্বদেশী বাবুরা কদিন হলো না খেয়ে আছেন, তবুও আজ 'বিহান-বেলা' ফাটকে তাদের ওপরে মারপিঠ, লাঠি, গুলিও নাকি চলেছে। যাদের জখম বেশী সেই সমস্ত বাবুকে সদর হাসপাতালে আনা হয়েছে। খবরটা সম্ভবত হাসপাতাল থেকেই সহরের চারদিকে রটেছিলো। তাই কংগ্রেসীরা পুলিশের এত কড়াকড়ির মধ্যেও কাল হরতাল ডেকে বসেছেন।

ভূষণ এতে আপত্তি করলো। সে সহরে ঘুরে ঘুরে জাবনার ঘাস বেচে—তাজা সবুজ ঘাস। "সেই যে বলে না 'সুখে থাকতে ভূতে কিলায়'! জেহেলখানায় দিব্যি বস্তা বস্তা ভাল

মন্দ গিলছে তাতে আবার উপাস ক্যানে ? খায়োকা অনাসিষ্টি কাম্‌না থাকলে যা হয়। আর না খাওয়ার জন্যে হত্তাল ক্যান্‌রে বাপু ? আমার মায়ের প্যাটের ভাই নলিতও তো দুদিন না খেয়ে আছিল। কই তখন তো কোন শালা হত্তাল করেলিকো ?

"উ ব্যাটার যত সব আদেখলে কথা। লক করে থাক। তোর ভায়ের না খাওয়া আর বাবুদের না খাওয়া এক রে ? ছোটলোক কাঁহাকার! রা কাড়বি না।" বেচা-কেনার মাঝখানে আসন্ন শীতের খোলা হাওয়া উপেক্ষা করেই গুলতানি জমে উঠলো। কাল সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাদের বিরাম। সকালে তাদের সাত তাড়াতাড়ি ওপারে যেতে হবে না সওদা নিয়ে।

প্রত্যুষের প্রাত্যহিক ব্যস্ততায় আজ ছেদ পড়েছে। এখানে ওখানে জটলা হচ্ছিলো—কেউ কেউ বা এখনো বিছানাই ছাড়েনি, অবশ্য শীতের সময়েও এই খড়গুলোর ওপর ময়লা মাদুর ও কাঁথাটাকে যদি বিছানা বলা যায়। আজ রোজগার না হলেও ফুরসুৎটা উপভোগ করার মত। কিন্তু খেয়াঘাটে বেশ সোরগোল। সাদা খদ্দরের টুপি মাথায় কয়েকজন যুবক দাঁড়িয়ে আছেন—উদ্দেশ্য শহরে যাতে কিছু চালান না যায় সেদিকে নজর রাখা। ক্ষেমেনও এই দলেই ছিলো। সে শিবনাথকে নিয়ে আলের রাস্তা দিয়ে গ্রামের ভিতর দিকে চললো। হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার রমানাথ বাবুর এখানে একটা ডিসপেন্সারি মত আছে। সেখানে বিকেলে 'প্রতিবাদ সভা' করা যায় কিনা তার চেষ্টা দেখতে হবে।

"আচ্ছা ক্ষেমেনবাবু, জায়গাটা খুব ফার্টাইল মনে হচ্ছে। প্রত্যেক ফুট জমিতেই কিছু না কিছু ফলন হয়েছে দেখা যায়।"

"হ্যাঁ, চরের জমিগুলো সাধারণত উর্ব্বরই হয়। আর তা ছাড়া এ চরটা বেশী দিনেরও নয়।" ক্ষেমেন উত্তর করলো।

"কি করে বুঝলেন ? আপনি আবার লেয়ারও চেনেন নাকি ?"

"নাঃ, আপনারা কলকাতার লোক সম্ভবত চরটর দেখেননি। নইলে আপনিও বুঝতে পারতেন।"

"চর, অনুচর অনেক দেখেছি। সেদিন ট্রেনেও একজন সঙ্গে ছিলো। আজও কেউ পিছু নিয়েছে কিনা কে জানে। যা দিন কাল।" শিবনাথ সত্যি একবার পিছন ফিরে তাকিয়ে নদীর ঘাট পর্য্যন্ত দেখে নিলো।

মৃদু হেসে ক্ষেমেন বলতে আরম্ভ করলো, "আমাদের ছেলেবেলাতেও দেখেছি চরটা এত বড় ছিলোনা। ক্রমশ এটার কলেবর বাড়ছে। মুহুরী মশাইয়ের কাছে শুনলাম এই চর গজানোর গল্প—কিম্বদন্তীই হবে। তিনি বললেন, 'ওপারে আমাদের সহরটার প্রান্তে ধলাপিসি নামে এক অনিন্দ্য সুন্দরী বিত্তশালিনী বিধবা যুবতী বাস করতো। বড় জমিদার, ব্যবসাদার থেকে আরম্ভ করে যাত্রা দলের বখাটে ছোঁড়ারা পর্য্যন্ত অনেকেরই ওর ওপর লোলুপ নজর ছিলো। কিন্তু ধলাপিসি কাউকে ধারে কাছে ভিড়তে দেয় নি। শেষ পর্য্যন্ত সবাইকে ক্ষান্ত হতে হয়েছিলো—জোয়ারী নদীর তীরে এসে যেমন করে পথিককে থামতে হয়। প্রথমে প্রার্থীদের পরস্পরের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও

ব্যর্থ হবার পর কুৎসা রটনার ব্যাপারে সকলে একজোট হলো। সহর থেকে চেয়ারম্যানের মিথ্যা স্বাক্ষরের ফরমান গেল—ভদ্রপাড়ার সমাজে থেকে কুলটাগিরি চলবে না। সাত নম্বর ওয়ার্ডের মৃন্ময়ী দেবী ওরফে ধলাপিসি বাড়ী ছেড়ে চলে না গেলে তাকে যেতে বাধ্য করা হবে। তরুণ দল আগুনও লাগিয়ে দিতে পারে। ধলাপিসি নির্বিকার। বললেন, ওদের মুরোদ সব জানা আছে। কিন্তু কি আশ্চর্য্য আক্রোশ ঐ লোকগুলোর! একদিন মাঝরাতে তারা ধলাপিসিকে জোর করে নৌকোয় তুললো—গাঙ্ পার করে একেবারে অন্য জেলায় রেখে আসবে। কিন্তু মাঝপথে বর্ষার ভরা নদীর দুরন্ত ও ভয়াবহ রূপ দেখে মাঝির দল নাকি এ রকম জায়গায় ধলাপিসিকে জোর করে জলে ফেলে দিয়ে ঘাটে ফিরে এসেছিলো এবং তাকে ঠিক ঠিক ওপারে পার করে দেওয়া হয়েছে বলে বেমালুম কবুল করেছিলো। আসল ব্যাপারটা নাকি কিছুদিন পরে জানাজানি হয়ে যায়। কিন্তু তখন এখানে চর পড়তে আরম্ভ করেছে। যেখানে ধলাপিসি ভরা যৌবন নিয়ে সলিলসমাধি পেয়েছিলো সেখানে নদী ভরাট হতে সুরু করলো।' সমাজের এও আর এক ধরণের বলি, কি বলেন? তবে এ গল্পটা যদি সত্যি হয়। এ নদীটা এখন দু ভাগে ভাগ হয়ে গেছে—চর থেকে উত্তর দিকে আমাদের সহর পর্য্যন্ত এই অংশটাকে ছোট গাঙ্ বলা হয়। আর দক্ষিণ দিকের ওটাকে বড় দরিয়া বলে। তার পরেই অন্য জেলা।

"চারটাতে সত্যি নানা রকমের ফসল হয়। সব কিছুই—মেহনতের সমস্ত ফসলই এরা ছোট গাঙ্ পার হয়ে আমাদের সহরে বিক্রি করে আসে। ধান, চাল, ডাল, বিচালি, শাকসব্জী, তরিকারি, দুধ, ছানা, ডিম, মাছ, হাঁস, মুরগী, এমন কি ছাগল, ভেড়া, গরু, মোষ পর্য্যন্ত এখান থেকে চালান যায়। এ ছাড়াও এখান থেকে আমাদের উকিল-মোক্তারদের মক্কেল ও ডাক্তারদের রোগী যায়। কুলি-কামিন, এমন কি কারখানার মজুরও পাওয়া যায়।"

"জ্যান্ত ট্রাফিক যায় না?"

"হ্যাঁ, তাও বোধহয় যায়। মোটকথা এই চরটাই আমাদের সহরটার প্রধান সরবরাহ কেন্দ্র। সহরটাকে বাঁচিয়ে রেখেছে এরাই। পাইকার আড়তদারেরা আবার এদের কাছ থেকে মাল কিনেই ট্রেনে বা ষ্টিমারে করে অন্য জায়গায় চালান দেয়। কাজেই চরটাকে বলা যেতে পারে আমাদের সহরের 'hinterland', বাংলা ভূগোলে যাকে আজকাল বলা হয় 'পশ্চাদভূমি'। এই জন্যেই সহরের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বানচাল করে দিতে হলে চরের মুখে নদীর এই খেয়াঘাটে পিকেটিং করাই বেষ্ট।"

"আচ্ছা ক্ষেমেনবাবু, এই পশ্চাদভূমির লোকেদের এত 'ব্যাকওয়ার্ড' করে রেখেছেন কেন?"

"এদের একটু এগিয়ে নেবার জন্যে একবার কিছুটা চেষ্টা করেছিলাম। —ইচ্ছে ছিলো, দলের একটা ভাল 'সেল' এখানে গড়ে তুলবো। কিন্তু ধলার চরের সবচেয়ে বড় জমিদার রাখালবাবুর প্রগতিশীলা সমাজবাদী এবং একমাত্র উত্তরাধিকারিণী বড় মেয়ে মনিকা দেবী আমাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে বুঝিয়ে বললেন, 'দেখুন বলছিলাম কি ফাষ্ট থিং ফাষ্ট; রাশিয়া প্রথমেই উত্তর মেরু বা তুন্দ্রা প্রদেশের দিকে নজর দেয় নি। কাজেই আপনারাও আপতত ধলার চরের সংস্কার-প্রচেষ্টা থেকে

ক্ষান্ত হন—নাইট স্কুলটা বন্ধ করে দিন। আর সবাই যদি লেখাপড়া শিখে ভদ্রলোক হবে তাহলে আপনাদের চাষবাস করবে কে? ফসল উৎপাদন করবে কারা? মেকানাইজেসন না হওয়া অবধি চরের সংস্কার করতে যাওয়া উচিত হবে না।' সেই থেকে মনিকা দেবী নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি করে আসছেন। তাঁর জমির সমস্ত ধান চরের মেয়েরাই ভেনে দেয় কিনা। তাঁর বাড়ীর পরিচারিকারাও ঐ চরেরই মেয়ে।"

আজ ধলার চরে সূর্য্যাস্তের পর কর্ম্ম-কোলাহল। একে একে নৌকোগুলো পণ্য বোঝাই হয়ে জেলা সহর রামপুরের দিকে রওনা হচ্ছে। বাঁক-বাহীরা চাল ও ডালের ঝাঁকা পাটাতনের ওপর রেখেছে। পাশেই ঝুড়িতে বেগুন, পটল, কুমড়ো প্রভৃতি টাট্কা আনাজ ও শাকসব্জীর পসরা। পরের ক্ষেপে চললো বিকেলে-ধরা মাছ ও সঙ্গে ডিম সমেত মুরগীর দল। পাশে ধামায় লঙ্কা, পেঁয়াজ, আদা, হলুদও চললো। তার পরের দল নিয়ে চললো নিরামিষ বাজার—কলা, পেঁপে, শশা, শাঁকআলু প্রভৃতি ফলমূল; কলার পাতায় ঢাকা দুধ, দই, ও ছানা। সহরে এই পণ্য উজাড় করে বিক্রি করে এরা বোধহয় আজ গভীর রাত্রে এদের একমাত্র ক্রেয় কেরোসিন এবং লবণ সঙ্গে করে ফিরবে।

বঙ্কু মণ্ডলের বয়স কম হলেও সে ধলার চরের একজন মাতব্বর। তার বাড়ীর লোকেরা বলে সে সহরের বড় ইস্কুলে পড়েছে। বঙ্কু সবেমাত্র সহর থেকে ফিরছে—হাত নেড়ে সবিস্তারে সহরের হরতালের হালচালের কথা বলছিলো। সরকারী ইস্কুলের বাংলার বুড়ো মাষ্টারমশাই আজ নাকি চাক্‌রীতে ইস্তফা দিয়েছেন। কারণ, জেলে যারা মার খেয়েছে তার মধ্যে একজন তাঁর ছেলের নিকট বন্ধু এবং ছাত্রও বটে। কি আশ্চর্য্য! ঐ বুড়ো পণ্ডিতের এত তেজ? পেন্সনের মুখে সরকারী চাক্‌রী ছেড়ে দিলেন। অথচ কিছুদিন আগে তাঁর ছেলে কংগ্রেসী বলে পুলিশ পণ্ডিতমশাইকে সাবধান হতে বলায় পণ্ডিতমশাই তাঁর ছেলেকে শুধু বাড়ী থেকেই বের করে দেন নি—ছেলের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই, সে তেজ্য বলে পুলিশকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। বঙ্কু আরও জানালো পণ্ডিতমশাই ও তাঁর স্ত্রী আজ নিরম্বু উপোস করে আছেন। কাল সকালের আগে জল গ্রহণ করবেন না।

গল্পের ফাঁকে শিবু টাই অন্ধকারের মধ্যে সরে পড়লো। এইবার আর একটা নৌকো ছাড়বার সময় হয়েছে—তবে এবারে খেয়াঘাট থেকে নয়, দূরের মরা ঘাটা থেকে। শিবু তার বোন পাতুকে অনেক বোঝাবার পর এবারে রেগেই বললো, "খেজালৎ করিস্ না, লে এবারে চ। খামোকা বড়লোকের খোঁসায় পড়বি ক্যানে? চেয়ারমিন সাহেব এমনিতেই তো লোক ভাল নয়; বেহুদ্যামি এবারে রাখ।"

পাতু সাফ জানিয়ে দিলো—সে যেতে পারবে না। সারাদিন পেটে কিছু পড়ে নি, এবারে সে রান্না চড়াবে। হরতাল বলে কি পেটেও হরতাল? হরি মটর? বেমক্কা হরতাল করায় সকালে তেল কেনা যায়নি তাই হাঁড়িও চড়েনি। কিন্তু শিবু ছাড়বার পাত্র নয়। সে জানালো, "লবাব বিধবা বৌ, দীনার মেয়া সবু সব মরাঘাটে গেলুছে। তু হারামজাদি যাবি না ক্যান? তারাও

তো দিনমানে খাইনি। কি করে খাবে? তাদের জিনিষ সহরে না বিকোলে পয়সা আসবে কোত্থেকে? চেয়ারমিন, দারোগাবাবুরাই তোদিগে খাবার দিবে। ভাল খাবি। লে ওঠ্।"

অবশেষে মরাঘাট থেকে সেই নৌকো ছাড়লো--পুরুষ-যাত্রীহীন নৌকো। মতি, কোটি, হরিচরণের দুই মেয়ে পটলী ও বাগুনি, রাঙ্কাকাকির সঙ্গে পাতুও চলেছ—ওপারের সহরের দিকে। নৌকোর মাঝি ফেলা শীষ দিতে দিতে লগি ঠেলে চলেছে—জল এখন কমে আসছে কিনা। হঠাৎ ফেলাকে থামতে হলো: সামনেই দাঁড়িয়ে সাহা-চৌধুরী কুঠীর 'বড় বজরার নাগাল পাওগু।' "এই মাঝি ঠার যাও," হুকুম এলো। বজরার পেছনে বাঁধা রয়েছে একটি পান্‌সী ও জেলেডিঙ্গি। ফেলা অস্ফুটস্বরে যেন ধারা বিবরণী দিয়ে চলেছে, "পান্‌সিটা থেকে বজরার গা বেয়ে যে উপরে উঠলো ওটাতো মেয়েমানুষই—হ্যাঁ নির্ঘ্যাৎ মেয়েমানুষ, পষ্ট শাড়ী দেখা যাচ্ছে। এর পেছনে কয়েকটা হাড়ী, কলসী, ঝুড়িও বজরায় উঠলো। কিন্তু এবার ওরা ল্যাম্ফোটা আড়াল করে এক নজরে কি দেখছে? হাতটা চোখের কাছে; কিন্তু হাতে ওটা কি? হীরা বসানো সোনার গহনা? সোনা তো নিশ্চয়ই। ফিকে চাঁদের আলোয় কেমন চকচক করছে। পাটাতনের ওপরে উবু হয়ে বসে ঐ যে ব্রজেন কামরাটা। চোখে ঠুলির মত কি একটা লাগানো? সোনাটা আসল না নকল পরক করত্যাছে বোধ্ করি।" ফেলার নৌকোয় পাতু একবার বলে উঠলো, "এই বাগুনি, একটা পান সাজনা রে বহিন্। লা এখানডায় দাঁড়াবে মনে করি।" আর একটা ছই দেওয়া বড় নৌকো বজরার পাশে এসে থামলো—ডাঙা থেকে গুন টেনে ওটাকে ভিড়ানো হলো। সামাল! সামাল! চাপা রব উঠলো। এবারে বজরা থেকে ছই-নৌকোয় হাঁড়ী-কলসীগুলো চালান হচ্ছে। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে ভাল করে নজর করলে দেখা যায় সেখানে লাউ, কুমড়োর স্তূপের নীচে শনের বস্তা। "উ সব নিশ্চই কয়লা বা চিনি রাখেলছে। উ দুটা চীজ্ই সমান আক্রা। খোলা বাজারে কিনতে গ্যালে তো হদিসই পাওয়া যায় না কো।" —ফেলা বলে চলেছে—"আরে, আরে! ওটাতো বঙ্কুদা, তার পাশে যদু ল্যাম্ফোতে আবার যেন কিসব ঠাহর করে দ্যাখালছে। হিসাব কিতাব! না কাগজের লোট্! লোট্ই হবেক! আর বোধকরি উগ্‌লা হাজার টাকারই লোট্। যদু তাহলে এক সাতেত হাজার টাকা নিল? উয়াদের কপাল। ও তাই বঙ্কু বুলে,—হপ্তালের পর গাঁঝ বাজারে তোদের মাল কেডাই বা কিনবে। পাইকারকে দিয়ে যা। উ বুঝি পাইকারের হয়ে দালালী করে। পড়া লিখার কি গুন দ্যাখো!···আরে, আরে! উগ্‌ল্যা বজরা থেক্যা গাঙে উয়ারা হড়হড় ঢালত্যাছে কি? পিথম তো গুটা কয়েক আস্ত বস্তাই ফাল্যায়ে দিলো। এখন বস্তার মুখ খুল্যা ফেলিলছে। ও-ও, বস্তার দরদ জম্মি লাগ্যাছে বুঝি···আরে ওগুল্যাতো চ্যালই গাঙে ফেলছে; বিলকুল চ্যাল। কি তাজ্জব ব্যাপার! আক্রাগুণ্ডার বাজারে চ্যাল পাওয়াইতো ভার। এবারে আবার ধান ভালো হবেলাকো। এই আকালের মধ্যি খামোকাই উয়ারা চ্যালগুলা পাণিতে ঢালে সাবাড় করিছে ক্যানে!" ভাত নষ্ট করার জন্যে সেদিন সে ছেলেটাকে ঘা কতক বসিয়ে দিয়েছে। তখন তার কেমন ধারা গা জ্বালা করছিলো। "উয়াদের চ্যাল বেশী হয়েছে, না? তাই গাঙে ফ্যালালছে। উ চ্যাল আমাদের দিয়ে দেনা ক্যানে সস্তা কর্যা। না হয় ভিখই দে। বদলে

খাইগুন দিবো কয় মন চাস।···কাদের বুলছিলো ওপারে গঞ্জে নাকি লোকে চালের দোকানে হাতে কাগজ নিয়ে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। এই সহরেও তাই হয়্যালছে নাকি? যুদ্ধ ল্যাগেছে না আগুন ল্যাগেছে। এক মনিষ্যি ছাড়া সব কিছুরই দাম হু হু কর্যা চরত্যাছে,···যাহোক বঙ্কু বাহাদুর ছাওয়াল বটেক্!" —এতক্ষণে ফেলার আবার নৌকো ছাড়ার হুকুম হলো। কিন্তু ঘাটে ভিড়েও তার 'সোয়াস্তি' নাই। শীতের মধ্যে শেষ রাত্রিতে আবার 'বিটি গুল্যা'কে সহরের এখান থেকে ধলাচরের মরাঘাটে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। প্রায় রোজই তাকে এরকম করতে হয়—মাসের শেষে মাত্র পাঁচ টাকা দস্তরী। ফেলা শুধু একবার আপন মনেই বললো, "শিবুর বহিন্ পাতুডার রঙ্ কালা হলেও গড়নডা ভারি মজবুক।"

ধলা চরের এ অঞ্চলটাকে দক্ষিণ পার বলা হয়। জমি অপেক্ষাকৃত উঁচু এবং পলির পরিমাণও বেশী। পাশাপাশি কয়েক ঘর স্থায়ী বাসিন্দা আছে—চাই-মণ্ডল নয়, জেলার পল্লীসমাজ থেকে সম্ভবত 'বিতাড়িত' হয়েই এরা এখানে আড্ডা নিয়েছে।···কার্ত্তিক মাসেও গুমোট। কিছুক্ষণ আগে ঝির্ ঝির্ খানিকটা বৃষ্টি হয়ে গেল।

"পথ পিছল হবেনা তো?" সোহাগী তার মেয়ে দুলুকে উদ্দেশ্য করে বললো, "নে মা, এবার গা তোল। রাত গড়িয়ে আসছে। দেরী হলে হয়ত আবার কাদের নজরে পড়ে যাবো।"

দুলু বোধহয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে বসলো। বিছানায় তার শোবার জায়গার পাশেই কাঁথাটার ওপরে এক জোড়া পাশ বালিসের মাঝে ছোট বালিসটায় এখনো সেই ছোট টোল-চিহ্নটা দেখা যায়। ঐখানে তার খোকন মাত্র কদিন আগেও মাথা রেখে শুয়েছিলো। দুলুর তবুও সান্ত্বনা এই অজ পাড়াগাঁয়েও তাদের অভাবের সংসারে যতদূর সম্ভব খোকনের সে 'চিকিচ্ছা' করিয়েছিলো। বাঁচ না-বাঁচা তো ওপরওলার হাত। কাতু বিড়ালটা খোকনের দুধ খাবার বাটিটার দিকে এখনো একনজরে তাকিয়ে থাকে। ঐ দুধ থেকে ও 'পের্‌সাদ' পেত কিনা। খোকন মরে যাবার পরদিনই সোহাগী দুধের বরাদ্দ বন্ধ করে দিয়েছে। এ বাড়ীতে আর কচিকাচা নেই যে।

দুলু ঘরের জিনিষ কিছু কিছু সাজিয়ে রাখছিলো। লক্ষীর আসনে হাত দিতেই সোহাগী বলে উঠলো, "তুই নিজেরটা গোছগাছ কর দেখি, আমার ভাবনা আমি ভাববো।"

তালা বন্ধ করে তারা রওনা হবার আগে দুলু পোষা পায়রাটিকে খাঁচা থেকে উড়িয়ে দিলো। পথে পা দিয়ে দুলু বাড়ীটার দিকে একবার চেয়ে দেখল—কে জানে এইটাই শেষ চাওয়া কিনা! কবে ফিরে আসতে পারবে কিছুই তো ঠিক নেই।

মেয়ের হাত ধরে চলবার সময় সোহাগী বলে চললো, "বঙ্কু ছেলে ভালো! চাই-মণ্ডল হলে কি হবে পেটে বিদ্যে আছে কিনা। ওই যে সেবার সেই হাকিমের বৌ সোয়ামীর গঞ্জনা না সহ্য করতে পেরেই নাকি জলে ডুব দিয়েছিলো। মাঝিরা বৌটাকে জল থেকে তুলে তো পাচার করার ফিকির খুঁজছিলো। বঙ্কুই দেখতে পেয়ে বৌটাকে হাকিমের কাছে দিয়ে এসেছিলো।

হ্যানস্তা হলেও সোয়ামীর ঘর। হাকিমের কাছ থেকে ও মোটা টাকা বকশিস্ পেয়েছে নিশ্চই। লোকটা—কারবার বোঝে।"

মার অনেক কথার মাঝে দুলু শুধু একবার মুখ খুলেছিলো, "যাই বল মা, গাঁয়ের অনেকের ও ছিল্লে করে দিলো। ভিটের মাটি কামড়ে থেকে কি হবে বল্? চাল-ডাল যা মাগ্‌গি। শেষ অবধি কি মাটি খেয়ে থাকবি?···আর কিই বা এমন কাজ—কুটনো কোটা, বাটনা বাটা, আনাজ তরকারির খোসা ছাড়ানো, চাল ময়দার কাঁকর বাছা; সে তো ঘরেও করতে হয়। রান্নার জোগাড় দেওয়া মাত্র। এতে খারাপটা কি আছে? আর তাছাড়া তোদের ছাউনি, যেখানে লড়াই হচ্ছে, তার থেকে অনেক 'কোশ' দূরেই থাকবে। গত্তর খাটিয়ে যখন খেতে হবে।·····তাছাড়া ইজ্জৎ-সরমেরও কোন ভয় নেই—সবই ভদ্দরনোকের গির্দ্ধা। দরদামও ভালই পাওয়া যাবে।"

শেষের কথাগুলো সোহাগী খাটো গলায় বললো। "মা, গলা বড়ো করে থামোকা মেলাই বকিসনা। ঐ দেখ কাদের যেন কথা শোনা যাচ্ছে।"

আবার ঝির্‌ঝির্ বৃষ্টি সুরু হয়েছে। সোহাগী ও দুলু এসে পোড়ো মন্দিরটার নীচে দাঁড়ালো। ওপাশ থেকে কান্নার সুরে কে যেন বলছে, "গোস্তাফি মাফ্ হয় আল্লা রসুল্। কি মাটি খাওয়া কাম—আঁধারের বাজারে ইগ্‌লাই দস্তর। বাজান হয়্যা মেয়েটারে লায়ে তুলে দিয়ে আসু।"

গলাটা কেমন যেন চেনা মনে হয়। দুলু ফিস্ ফিস্ করে মাকে জিজ্ঞেস করলো, "মা এটা সেখ পাড়ার নৈমুদ্দির গলা না? ও এই মন্দিরে কেন?"

"কি জানি মা। চ এখন তাড়াতাড়ি। কার্ত্তিক মাসে কি আবার ঢলই নামে নাকি? জলের রকম সকম—দিশা ভাল ঠেকছে না।"

বড় দরিয়া দিয়ে ষ্টীমার গেলেও কোন পারঘাটা নাই, ছোট একটা খাঁড়ি মত আছে—জেলে পাড়ার লাগাই। সেখানে ছোট ছই-ঘেরা নৌকায় সোহাগী দুলুকে প্রসন্নপিসি আর বন্ধুর কাছে সমর্পণ করলো। নৌকো ছাড়বার আগে চোখ মুছতে মুছতে সোহাগী বসেছিলো, "মা ফি হপ্তায় চিঠি দিতে ভুলিস না কিন্তু।·····আর্-রু যদি পারিসতো মাঝে মাঝে কিছু পাঠাস।"

বড় দরিয়ার দক্ষিণ পার দেখে এখন মনে হয় যেন কিসের খেলা বসেছে। বা রাজে বিয়ে বাড়ীর বাসর হবে। নূতন সড়ক তৈরী হচ্ছে। টিপারা রোডের সঙ্গে গিয়ে মিশবে। দুপাশে ইঁট খোয়া, গাঁইতি, রোলার নিয়ে কুলিরা কাজ করে চলেছে। শব্দে দুলুর ঘুম ভেঙে গেল। তার গাড়ীটা অনেক বড়। জোড়া বলদে টানে। ছইয়ের ফাঁক দিয়ে সূর্য্যের আলো আসছিলো। রাত তাহলে ফরসা হয়েছে। দুলু গা মোড়া দিয়ে উঠে বসলো। গাড়ীটা দাঁড়িয়ে আছে। প্রথমেই নজরে পড়ে কাঠ দিয়ে ঘেরা গাড়ীগুলোয় কাতারে কাতারে শাকসব্জী—আলু, কপি, লাউ, কুমড়ো, তার পাশেই রাশি রাশি আখ, আনারস, কলা, লেবু প্রভৃতি ফলমূল। তার পরের গাড়ীগুলো বোরখার মত জাল দিয়ে ঢাকা। ঝুড়ির ওপর ঝুড়ি স্তূপ করে রাখা হয়েছে। কঁক্-কঁক্, প্যাক্-প্যাক বক্‌বকম্ প্রভৃতি আরো অনেক রকম শব্দ ভেসে আসছে। জাল দিয়ে ঢাকা ওগুলো হাঁস, মুরগী আরও কত কি পাখী। তার পরে ওগুলো প্যাকিং বাক্সে ভর্তি নিশ্চয় ডিম, চা, চিনি পাঁউরুটি হবে।

বস্তায় ওগুলো বোধহয় জমানো দুধের কৌটো। গাড়োয়ানের বসবার ফাঁকটা দিয়ে যতদূর দেখা যায়—শুধু ঝুড়ি, ঝাঁকা, বস্তা আর থলের রাশি। কৌনটিই শূন্য নয়। আর এর বেশীর ভাগই বোধ হয় এসেছে ধলার চর থেকে।

এপাশে নজর পড়তেই বোধহয় নিজের অজ্ঞাতেই দুলু আঁতকে উঠেছিলো। তার গাড়ীর মত ছই দিয়ে ঢাকা গাড়ী—চালের ফাঁক দিয়ে সুরমা-আঁকা একজোড়া টানা চোখ দেখা গেল। বৌটা আবার ঘোমটা দিয়েছে কেন! যত খোয়ার! ওর পিছনের গাড়ীগুলোর প্রত্যেকটিতে নিশ্চয়ই ওই রকম বৌ, ঝি আর মেয়েরাই রয়েছে। বৌয়ের মুখটা যেন কেমন ভারি ও ফ্যাকাসে। তাতো হবেই। অভাবী না হলে কি আর এদিকে আসে। এক নিমেষে দুলু বুঝে নিলো তার সহজাত বুদ্ধি দিয়ে, মর্ম দিয়ে অনুভব করলো ঐ শাকসব্জীর গাড়ী থেকে আরম্ভ করে হাঁস, মুরগী, গরু ভেড়া এবং তাদের সকলেরই গন্তব্যস্থল একই। সবাই এক জায়গায় যাবে—এক ঠাঁইয়ে একই গতি হবে। তফাৎ এই ওদের খোসা বা ছাল ছাড়ানোর পর একবার আগুনে রাখলেই রান্না হয়ে পরিবেশন হোয়ে যাবে। ওদের হয়ে যাবে মুক্তি। কিন্তু তাদের?

পাশের কয়লার বস্তার ওপর মাথা রেখে দুলু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বোধহয় কান্না শুনেই বন্ধু ছুটে এসেছিলো। দুলুকে সম্পূর্ণ সংযত দেখে বললো, "দিদি, উই দেখ্ কি পেল্লায় গাড়ী—গাড়ী না এক একটা দৈত্য। ওগুল্যাকে ট্যাঙ্কো বলে। কলির লড়ায়ের রথ। সামনে যা পায় পিস্যা উ রাস্তা করে লিয়ে চলে।"

বন্ধুর কথার উত্তর দুলু মনে মনে দিলো। তাই যদি হয় তাহলে ঐ রথের চাকায় আমাদের বেঁধে দিলে পারতিস্। সব জ্বালা একেবারে জুড়িয়ে যেত। মাটিতে পিসে পিছনে পড়ে থাকতাম।

উপন্যাস

পুরশ্চরণ

(পূর্বানুবৃত্তি)

মদন বন্দ্যোপাধ্যায়

চন্দ্রাবলী হাত ধুয়ে আস্তে আস্তে ওপরে বারান্দায় উঠে এল। শান্তি যেন একটু আনমনা হয়ে পড়েছিল। চম্পা কাছে এসে বললে, কি দেখবে বলছিলে, চল।

—ও হ্যাঁ, তাইতো রে—হাসল একটু শান্তি, তারপর বললে, একটু দাঁড়া, কালিদাসীকে রান্নাঘর থেকে এঁটো বাসনগুলো নিয়ে যেতে বলে যাচ্ছি।

নীচে রাতদিনের ঝি কালিদাসী বাসন মাজতে মাজতে আপন মনে খাটুনীর ফিরিস্তি নিয়ে বকে চলেছে। এটা ওর স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে।—আজ উনি ওখানে চলছেন, কালিদাসী আছে করবেখন। আজ এনার অসুখ—সব ঝকি অমনি কালিদাসীর। পোড়া অর্ধদ্ধের কালিদাসীর কোথাও যেতে নেই, অসুখ হতেও নেই।

—বালাই ষাট, অসুখ করতে যাবে কেন তোমার? অমন কথা মুখেও এনো না। ফিক্ করে হেসে ফেলে বললে শান্তি কালিদাসীকে বক বক করতে দেখে।

কড়া মাজা বন্ধ হয়ে গেল কালিদাসীর। মুখখানা ঘুরিয়ে একবার দেখে নিলে কে বলছে, তারপর ঘর্ষণ সুরু করে বললে, তুমি তো বলবেই, কাজ করতে তোমার ভাল লাগে কিনা। তাছাড়া হাড়ে এখন কত রস তোমাদের। তোমাদেরই যুগ গো দিদিঠান, আমরা তো শুকিয়ে ছিবড়ে হয়ে গেছি, আমরা কি আর পারি!

—ঠাকুমার থেকেও তুমি বুড়ি হয়ে গেছ নাকি?

—তেনার কথা ছেড়ে দাও, তেনার যুগ্যি কি আমি। কিসে আর কিসে! তিনি অসুখ গায়েও কাজ করেন নি? আজই তো দেখলে ভিরমি না লাগা পর্য্যন্ত কেউ জানতে পেরেছে তেনার অসুখ।

—তা বটে। কিন্তু একটু তাড়াতাড়ি হাত চালাও। আর রান্নাঘরের এঁটো বাসনগুলো নিয়ে এসে রান্নাঘরটা ধুয়ে উনুনে আঁচটা দিয়ে দেবে। কাকাবাবুদের আসার আগে রান্না সেরে ফেলতে হবে তো। ঠাকুরঘরের কাজে হাত দিলে আর তো বেরুতে পারব না, কি বল কালীদিদি?

—তা তো বটেই। তা আমি বরং আগে রান্নাঘর ধুয়ে উনুনে আঁচ দিয়ে দি, তারপর বাসনগুলো মেজে ফেলব। পোড়া তো আজ এক হেঁসেলের, নিরিমিষি হেঁসেল তো কর্তা মা করেনি।

—তাই কর কালীদিদি। আমি চলি। ওপরের ঘরগুলোতে ঝাঁটা দিতে হবে, বিছানা করতে

হবে। —এই বলে শান্তি ওপরে উঠে এল, তারপর চন্দ্রাবলীকে ডাকল, চম্পা, কোথায় রে তুই?

—এই যে শান্তিদি, মার ঘরে।

—দাঁড়া, আমি যাচ্ছি।

নীচের ঘরটায় দিকেলের আলোর থেকে ছায়ার প্রভাব বেশী। এই ঘরে ভুবনমোহিনী অরে বেহুঁস। শিয়রে বসে সত্যজিৎ তাঁর মাথায় কপালে হাত বুলচ্ছিল ওর স্বভাবগত আড়ষ্টতা নিয়ে। কোন কথাবার্ত্তা নেই। থম থম করছে যেন সব। মাঝে মাঝে ভুবনমোহিনীর অস্ফুট গোঙানী সত্যজিতের মনে ভয় আনে—ঠাকুমা যদি মরে যায়! অথবা যদি ভাল না হয় তাহলে কি হবে! ভাবতে পারেনা সত্যজিৎ, তারপর কি হবে। ভুবনমোহিনী যদি মরে যান তাহলে বিকল হয়ে যাবে মুখুজ্জেদের সংসার? যাবে না, হয়ত চলবে, আগের মতই চলবে। সত্যজিৎ আজ যেমন ভাবতে পারে না, সেদিনও ভাবতে পারবে না এ কেমন করে হল।

বাসন মাজার আওয়াজ আসছে। কালিদাসী বাসন মাজছে। কথা বলছে কে? শান্তিদি। সত্যজিতের মনটা ফিরে গেছে ঘটনার সন্ধানে। ভাবনা আসে যায়, কিন্তু ঘটনা পেলে মন ছুটল তার পিছু। একা একা কেউ কি থাকতে চায়।

—কি রে সতে, তুই কেন? যা না বেড়াতে, আমি বেশ আছি শুয়ে, যা। —ভুবনমোহিনী চোখ মেলে অরের ঘন নিশ্বাস ফেলে বলেন।

—তোমার যে বড্ড অর ঠাকুমা।

—তা হোক, তুই যা। তোকে সেবা করতে হবে না, ঢের হয়েছে। —পাশ ফিরলেন ভুবনমোহিনী।

সত্যজিৎ কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল, তারপর আস্তে আস্তে ঠাকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

চার

দোতলায় দ্বিজবালার ঘরে একটা বড় আয়না আছে। প্রমাণ এক মানুষ লম্বা কাঁচ। বেশ চওড়া আর কাজ করা। দীননাথের বাবার আমলের জিনিষ। আয়নাটার সামনে দাঁড়ালে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হয়। বেশ ভালভাবে নিজেকে সম্পূর্ণ করে দেখার লোভটা মিটিয়ে নেওয়া যায়। কিন্তু এ ঘরের যাঁরা কর্ত্তা এবং কর্ত্রী তাঁরা দুজনেই নিজের প্রতি বোধহয় চিরকালই উদাসীন। তাই একটা সাদা চাদর দিয়ে ঢাকা থাকে আয়নাখানা। ব্যবহার হয়না। ছেলেমেয়েরা বাবা আর মায়ের মতই। তারা কেউ কোনদিন এ আয়নাটার সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছে কিনা সন্দেহ হয়।

আজ সেই আয়নার ঢাকনা খুলে দিয়েছে শান্তি। আর ঐ আয়নার সামনে চন্দ্রাবলীকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বললে, নে, দেখে নে ভাল করে। আ মর, অত আড়ষ্ট কেন? পরপুরুষ কেউ তো আর নেই, তবে আমাকে—আহা আমি যদি এমন ভাগ্যি করতাম, তাহলে তোর গৌরাঙ্গী মৃণালভুজে সবসময় আবদ্ধ হতুম।

—আঃ যাও শান্তিদি। —রাঙা হয়ে ওঠে চন্দ্রাবলী। তবু ভাল লাগছে অসম্ভব রকমের। শান্তির কথাগুলো কত মিষ্টি।

—মনে কর আমি পুরুষ। আমার পৌরুষ দিয়ে তোকে আমি জয় করেছি। আর সেই জয়চিহ্নের প্রতীক তোর সিঁথিতে টকটকে লাল একটি রেখা। বিবাহপর্ব সাঙ্গ হল, কেমন? এবার ফুলশয্যার মধুর রাত্রি, তুই আমি আর ফুল—কি মনে হচ্ছে?

এবার হেসে ফেলে চন্দ্রাবলী বললে, কি আবার মনে হবে? গল্প শুনছি।

—গল্প শুনছিস বুঝি? সত্যিই কিছু হচ্ছে না, গল্প হচ্ছে—কারণ তুইও মেয়ে, আমিও মেয়ে। এই তো সত্যি, কি বলিস? শান্তি ছেলেমানুষের মত হাল্কা হাসি হাসল। তারপর হাসি থামিয়ে বললে, জানিস মনে করলে সব হওয়া যায়, সব করা যায়। সবই মনের ব্যাপার। শ্যামভাইকে দেখিস তো, সময় সময় রাধাভাবে বিভোর হয়ে যায়। রস সবখানেই, রসিক জনকে শুধু খুঁজে নিতে হয় রে। এই তোর রূপ দেখে সময় সময় যদি আমার মন চায় তোর রূপে বিভোর হয়ে যাই, তাহলে নিশ্চয় যাব। যাক তত্ত্বকথায় আর কাজ নেই। তোকে যা দেখাতে এসেছি, দেখাই দাঁড়া। দরজাটা বন্ধ করেছিস?

—হ্যাঁ।

নীচে কাউকে দেখতে না পেয়ে সত্যজিৎ ওপরে এল। কাকাবাবুর ঘরে কেউ নেই। দরজার সামনাসামনি স্বামী বিবেকানন্দের একটা বড় ছবির সঙ্গে সত্যজিতের চোখাচোখি হয়ে গেল। এই ছবিগুলোর যেন একটা ভাষা আছে, মন যা অনায়াসে বুঝতে পারে। পরস্পর ওরা কথাবার্তা দিব্যি কয়ে নেয়। ইতিহাসের সঙ্গে কথাবার্তায় মন যে তৃপ্তি পায় সত্যজিৎ আজ বেশ উপলব্ধি করল। ঠাকুমা চলে গেলেও তাঁর ইতিহাস থাকবে। সেই ইতিহাস আর সত্যজিতের মন—এখন যেন ঠিক মাথার মধ্যে আসে না। পাশে ঠাকুরঘর। এ ঘরের একটা নিজস্ব গন্ধ আছে—ফুল-ফলের মেশা গন্ধ। ভারী মিঠে। সত্যজিতের ভাল লাগে। অছদিন ঘুরেছে বারান্দা দিয়ে অন্য মনে অন্য উপলক্ষ্যে। কিন্তু আজকে এইসব ঘরগুলোতে একা একা ঘুরে বেড়ানর মধ্যে একটা স্বকীয়তা আছে। তার আজকের মন আর এই ঘরগুলো মুখোমুখি কথা বলছে। আর কেউ নেই কোথাও।

সামনে মার ঘর। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। কে আছে? শান্তিদি। কি করছে? হাসির শব্দ—হাসছে শান্তিদি। মন কেমন একটু বিক্ষুব্ধ হল সত্যজিতের। হয়তো তার নিটোল বেদনাকে ও বিদ্রূপ করছে। জানলাটার পাশে এগিয়ে গেল সত্যজিৎ। কিন্তু একি হচ্ছে, খেলা? কাপড় নিয়ে টানাটানি। ছিঃ—খেলার আর সময় নেই? চন্দ্রাটার তো হুঁস থাকা দরকার! আস্তে আস্তে সরে গেল সত্যজিৎ ছাদের সিঁড়ির ধারে।

দ্বিজবালার ঘরে চন্দ্রাবলী এদিকে নতুন করে দেখছে নিজেকে। শান্তির দীক্ষা বোধহয় সার্থক। নিজের প্রতি সচেতনতার মধ্যে একটা আত্মগত আনন্দ আছে, যা নিজে থেকেই ভরপুর

থাকে। চন্দ্রাবলী নিজের দেহকে দেখছে—তার উন্নত বলিষ্ঠ যৌবনদীপ্ত দেহাবয়বের সৌন্দর্যে তার নিজেরই চোখ ধাঁধিয়ে গেছে।

—সত্যিই চন্দ্রা, তুই ভাগ্যবতী। এমন রূপ পাওয়া অনেক জন্মের পুণ্যফল। শান্তির কণ্ঠস্বরে পরিতৃপ্তির আভাস।

চন্দ্রা চাইল শান্তির দিকে। চোখে ওর স্বপ্নের আবেশ। চোখের কোলে এক টুকরো হাসিতেও সেই ইঙ্গিত।

—নিজের রূপে যে নিজেই মজলি। মুচকি হেসে চন্দ্রার রক্তিম গাল দুটো টিপে দিল শান্তি।

চন্দ্রা কিছু বলল না। হাসল শুধু এক ঝলক।

—এবার একটি ভাল পাত্র চাই, কি বলিস? সামনের ফাগুনেই যাতে চার হাত এক হয় তার একটা ব্যবস্থা করতে বলতে হবে।

—এই যাও, তুমি বড্ড ইয়ে—

—ইয়েই হই আর ওই হই, এবার তোমার পালা। ঠাকুমার যখন মন হয়েছে তখন আর ভাবনা কি? আচ্ছা, কেমন বর তোর পছন্দ হয় বল্ তো? আমাদের ওই বলাইচাঁদের মত? বেশ কালো মোটাসোটা কেষ্ট ঠাকুরটির মত।

—ধ্যেৎ! ও আবার বর নাকি! ওতো মড়া পুড়িয়ে বেড়ায়।

—ওমা, মড়া পোড়ায় বলে ওর বর হতে নেই বুঝি? তা, তোর মতে না-হয় বলাইচাঁদের বর হবার কোন গুণই নেই, তাহলে তোর বরটা কি রকম হবে শুনি?

—জানিনা, যাও, তুমি বড্ড—। কথা থেমে যায় মাঝপথে চন্দ্রাবলীর।

শান্তি হেসে ওর থেমে যাওয়া কথাটুকু শেষ করলে, বড্ড ভাল, নয় রে? কিন্তু আজ বলতেই হবে তোকে। না শুনে আমি ছাড়ছি না। এই বলে শান্তি চন্দ্রাবলীকে নিবিড় করে জড়িয়ে ধরল।

—ছাড়, লাগে যে।

—না, ছাড়ব না।

—রান্না করতে যাবে না। কত বেলা হল।

—ও, পাশ কাটান হচ্ছে? বেলাই হোক আর যাই হোক, না শুনে ছাড়ছি না—বল্ কেমন হবে? নিজের বাহুর মধ্যে চন্দ্রাকে আটকে রেখে বললে শান্তি।

—ছাড় আগে, বলছি।

—নে, ছেড়ে দিলাম। শান্তি বাহু মুক্ত করল। চন্দ্রাবলী একটু সরে গেল, তারপর শান্তির দিকে এক পলক চাইল।

—কৈ রে, বল্না। কেমন হবে তোর বর? কেষ্ট ঠাকুরের মত?

চন্দ্রাবলী শান্তির দিকে একটু মুচ্‌কে হেসে ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

—তবে নদের গৌরের মত?

এবার স্মিত হাসি হাসে চন্দ্রাবলী। হেসে ঘাড় নেড়ে জানালো, হ্যাঁ। তারপর মুখ নীচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

শান্তি এবার আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে চন্দ্রাবলীর চিবুক ধরে বললে, কিন্তু সখি, জানতো বিষ্ণুপ্রিয়াকে ফেলে গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু পালিয়েছিলেন। তুমিও কি তাই চাও নাকি?

—তা হোক, তবু ভাল।

—তাই নাকি? এত মনে ধরেছে যে পেয়ে হারাতেও সুখ।

—হারালেই তো হারিয়ে যায় না, থাকে। বিষ্ণুপ্রিয়ার তো ছিল, শ্যামভাই তো তাই বলে।

—ও: এই ব্যাপার, মাধাটি তোমারও গেছে? আমার না-হয় কোন উপায় নেই, কিন্তু তুই কেন মনটাকে পোড়াচ্ছিস মুখপুড়ী?

—কোথায় আবার মন পোড়াচ্ছি। দিব্বি তো স্কুলে যাচ্ছি, খাচ্ছি, খেলছি। হাসতে হাসতে বললে চন্দ্রাবলী।

শান্তি একদৃষ্টে চন্দ্রাকে দেখল, তারপর বললে, সবই দেখতে পাচ্ছি—এখন চল্ দেখি রান্নাঘরে। দরজাটা খোল্।

শান্তি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলে গেল, কাপড় কেচে রান্নাঘরে আয়। ময়দা মাখতে হবে।

একটি সুরের গুনগুনানি, কীর্তনের একটি কলি হঠাৎ চন্দ্রাবলীর কণ্ঠে এল। প্রাণমাতানো আনন্দের উচ্ছলতার ঢেউ। ভাল লাগছে—খুব ভাল লাগছে। নাচতে ইচ্ছে করছে চন্দ্রাবলীর। মনের কোন দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, ভাবনা কিছুই থাকবে না। শুধু ঝরণার মত তর তর করে খুসির স্রোত বইবে, একটু আটকাবে না, থামবে না, কেউ বাঁধবেনা চন্দ্রাবলীকে।

নীচে থেকে শান্তির ডাক আসে, কইরে চন্দ্রা, এতক্ষণ কি করছিস? এদিকে উনুন যে ধরে গেল।

—এই যে যাই। বেশ উচ্চ কণ্ঠে চন্দ্রাবলী বললে। এত জোরে কথা ও বোধহয় এই প্রথম বললে। কোন আড়ষ্টতা নেই, বেশ সহজ চট্‌পটে স্বর। —না, আর দেরী নয়, কাজ আছে যে তোমার, হঠাৎ এত খুসি কোথায় পেলে—আয়নায় আর এক চন্দ্রাবলীকে চন্দ্রা খুসির স্বরে চোখ পাকিয়ে জিজ্ঞেস করে। —না, বড় দুষ্টু হচ্ছ, এত না, চল গা ধুয়ে আসি এখন। অত ব্যস্ত হয়োনা। ধীরে ধীরে, কেমন?

(ক্রমশঃ)

সংস্কৃতিপ্রসঙ্গ

শিশুপ্রতিভা সম্মেলন : আলাউদ্দীন সঙ্গীত সমাজ

দেখা গেছে, কলাচর্চার কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুরা বয়স্কদের সমান যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছে। অধুনীলনের সবগুলো স্তর না পেরিয়েও কি করে তা শিশুদের আয়ত্ত হল আশ্চর্যের কথা। তবে অনেক ক্ষেত্রেই এরূপ পারদর্শিতা বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তেমন তাল রাখতে পারে না। তাই এককালে যে-শিশু অঙ্কন-নৈপুণ্যে, কি কণ্ঠসঙ্গীতে, কি সেতার-বাদনে সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করে, পরবর্তীকালে তার দক্ষতার তেমন পরিণতি না-দেখে অবাক হতে হয়। কিন্তু তার জন্যে হা-হুতাশ করে লাভ নেই। এ-ই বোধ হয় প্রকৃতির নিয়ম।

আর সে-কারণেই যাঁরা শিশুদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী কিংবা ছোটদের গান-বাজনার আসরের ব্যবস্থা করেন, তাঁরা ধন্যবাদের পাত্র। উচ্চাঙ্গসঙ্গীতে ছোট ছেলেমেয়েরা কতদূর এগিয়েছে তার নমুনা পাওয়া গেল সম্প্রতি অনুষ্ঠিত আলাউদ্দীন সঙ্গীত সমাজের শিশুপ্রতিভা সম্মেলনে। প্রাক্-কৈশোর বয়সের প্রায় চল্লিশ জন শিল্পী কণ্ঠসঙ্গীত, যন্ত্রসঙ্গীত ও কথক নৃত্যে যে গুণপনা দেখালেন তা মুক্তকণ্ঠে প্রশংসার যোগ্য। শ্রীমান সুনীলকুমার সাহার সেতার এবং তার সঙ্গে শ্রীমান সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়ের তবলা-সঙ্গত চোখে না দেখে শুধু কানে শুনলে বিশ্বাস করা কঠিন যে দুজন শিল্পীরই বয়স বারো বছরের কম। তিন বছরের মেয়ে রূপাঞ্জলি—ভালো করে কথা ফোটেনি, অথচ সুর, তাল ঠিক আছে। রেণুকা শীল, ঋণা গঙ্গোপাধ্যায়, পান্থ, স্বপ্না সেনগুপ্ত, রীতা মিত্র, দীপালী বন্দ্যোপাধ্যায় এঁদের বিচ্ছিন্নভাবে দেখলে প্রত্যেকেরই উল্লেখ করতে হয়। পুরস্কার বিতরণের দিন এই সব ছেলেমেয়েদের কপালে আশীর্বাদ-টীকা দেবার সময় উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়লেন গুণী ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁন। অশীতিপর বৃদ্ধ তাঁর উত্তরাধিকারীদের একে একে বুকে তুলে নিচ্ছেন—মুখে হাসি, গলায় গান, বললেন—নাচতে ইচ্ছে করছে।

এমন সুন্দর অনুষ্ঠান, কিন্তু অসঙ্গতিও কম নয়। সভাপতি করে যাঁদের আনা হয়েছে তাঁরা কোন্ যোগ্যতায় এক্ষেত্রে প্রধান হবার অধিকার রাখেন? কোনরকম শিল্পেই তাঁদের সামান্যতম দান আছে বলে জানা যায় নি। তাঁরা শিল্প-রসিক বা সমঝদারও নন। সম্মেলনের অনুষ্ঠান কালে একজন শিল্পী যখন খেয়াল গাইছিলেন তখন সভাপতি মশায় সাড়ম্বরে মাথা নেড়েও হাতে তালি দিয়ে নিজেকে সমঝদার প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু একটু লক্ষ্য করলেই দেখা গেল তাঁর হাত নাড়া ও মাথা দোলানো একান্ত বেতালা ভাবে চলেছে। অথচ কয়েকজন যোগ্য ব্যক্তি এই কদিনের অনুষ্ঠানে সাধারণ দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন।

অবনীন্দ্র-জন্মোৎসব : বৈতানিক

ঠাকুরবাড়ীতে বৈতানিকের উদ্যোগে এক গীতি-মধুর ও ভাব-গম্ভীর পরিবেশের মধ্যে শিল্পাচার্য

৭ক

অবনীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হল। আজকের বাঙালী ঐতিহ্যচর্চা থেকে ভ্রষ্ট—নবীন শিল্পী বা সাহিত্যিক কারো মধ্যেই পূর্বসূরীদের সম্পর্কে তেমন উৎসুক্য দেখা যায় না। ফরাসী ছবির নকল কিংবা মার্কিন উপন্যাসের অনুকরণ করেই এদেশের শিল্পী বা সাহিত্যিক ভাবছেন সিদ্ধির শেষ সীমায় উপনীত হয়েছেন বুঝি। আর তার সঙ্গে কিছু নগদ-বিদায় পেলেই জীবন ধন্য হয়ে গেল।

তাই অবনীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালন করার জন্যে প্রথমেই বৈতানিককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ঐদিনের অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ। সভার উদ্বোধন হয় একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। অবনীন্দ্রনাথের সাহিত্যপ্রতিভা সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ ভাষণে অধ্যাপক রথীন্দ্রনাথ রায় বলেন যে, অবনীন্দ্রনাথ রূপকথার বাদশা—অনেক বহু পুরাতন গল্পকেও নূতন করে বলেছেন ; চিত্রধর্মীতা, বর্ণময়তা ও সুরমাধুর্য তাঁর রূপকথায় লক্ষণীয়। কারণ তিনি যে কথা বলেছেন তার আড়ালেই আছে এক অপূর্ব রূপলোক। রূপকথার জাদু-মেশানো তাঁর ষ্টাইল। তাই শিল্প সম্পর্কে দুরূহ আলোচনাও সমানভাবে উপভোগ্য হয়েছে—পাণ্ডিত্যের পরুষতাকে অতিক্রম করে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে আবেগস্পন্দিত রসবোধ। তাঁর আত্মস্মৃতিমূলক রচনা আত্মকথন হয়েও একটি মহৎ কালের অন্তরঙ্গ ইতিহাস। এক যুগসন্ধির মুহূর্তে দাঁড়িয়ে প্রবীণ শিল্পী যেমন মহতী অতীতের স্মৃতির মালা গেঁথেছেন, তেমনি সেই যুগের অস্তগোধূলির ম্লান আলোকটুকুকেও ব্যথার আলোয় শিখায়িত করে তুলেছেন। অবনীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ষ্টাইলিষ্ট—তাঁর রীতি সহজ কথকতার, ভঙ্গী সহজ আলাপচারণার।

সভাপতির ভাষণে শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ঠাকুর পরিবারের গৌরবান্বিত ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সুরেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথের এক একটি অত্যন্ত বিরল ও অন্তরঙ্গ ছবি ফুটিয়ে তোলেন। শ্রীঘোষ বলেন যে, এ বাড়ীতে এলে যেন দ্বিজেন্দ্রনাথের উচ্চ হাসির রোল এখনও শোনা যায়, রবীন্দ্রনাথ-গগনেন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথের কত সাধনার ইতিহাস এই বাড়ীর সঙ্গে যুক্ত। অবনীন্দ্রনাথের শিল্প-সাহিত্য-প্রতিভা নব্য বাঙলার সংস্কৃতিকে প্রাণ দিয়েছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রাণখোলা সাদাসিধে মানুষ—তাঁর রচনারীতির মধ্যেও তার ছাপ আছে। যে বাড়ীটি ভেঙে ফেলা হয়েছে তার কথা বলতে গিয়ে তিনি দীর্ঘশ্বাস ফেলেন, কারণ সেইটিই ছিল দ্বারকানাথের বৈঠকখানার বাড়ী। অবনীন্দ্রনাথের প্রতিভার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে গিয়ে তিনি গত শতাব্দীর সাংস্কৃতিক জাগরণের কথাও আলোচনা করেন। আশী বছরের প্রবীণ সাংবাদিকের কণ্ঠ মাঝে মাঝে স্মৃতি-বেদনায় উদাস হয়ে উঠছিল। বৈতানিকের সভ্যরা দশটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশন করেন। সঙ্গীত ও স্মৃতির সৌরভে সমস্ত পরিবেশ যেন মুখর হয়ে উঠেছিল। বণিক কলকাতার অঙ্কশায়ী জোড়াসাঁকোর প্রাসাদমালার ভগ্নাংশটুকুও যেন অতীত-কীর্তির একটি বেদনাময় রূপকথা মনে হচ্ছিল।

বর্ষামঙ্গল ঃ কথাকলি

রঙ্গীতে অনুষ্ঠিত কথাকলির 'বর্ষামঙ্গল' উৎসবে রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতা-পাঠ রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সেই সঙ্গে কিছু নাচেরও ব্যবস্থা ছিল। এবং এগুলোকে গ্রন্থন করে একটা সামগ্রিক আবেদন সৃষ্টির চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সত্যি বলতে কি তা সার্থকতার সীমায় পৌঁছয়নি। পৃথক ভাবে বিচার করলে অবশ্য অস্বীকার করার জো নেই যে দ্বিজেন মুখোপাধ্যায় এবং সুপ্রীতি ঘোষের গান তাঁদের সুনাম বজায় রেখেছে। কৃষ্ণচন্দ্র দে মশায়ের কণ্ঠ বা গায়কী কোনটাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপযোগী না হলেও তিনি তাঁর নিজস্ব রীতিতে নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায় ও পূরবী চট্টোপাধ্যায়ের গান একেবারেই প্রাণহীন লাগল। তবে এঁরা ভাল গান করলেও প্রতিষ্ঠানের কোন কৃতিত্ব নেই। যার জন্য প্রতিষ্ঠান গর্ব করতে পারেন তা হচ্ছে সমবেত কণ্ঠের গান। কিন্তু তার অনেকগুলিতেই হার্মনির অভাব দেখা গেল। গায়করা তেমন আত্মপ্রত্যয় নিয়ে গাইছেন বলেও মনে হল না।

নাচগুলির পরিকল্পনা শ্রীমতী দীপ্তি ঘোষের। এগুলি গতানুগতিকার গণ্ডী অতিক্রম করতে পারেনি। তার কারণ সৃষ্টিশীল প্রতিভার অভাব। এর জন্যে যে কল্পনাশক্তি, সূক্ষ্ম রসবোধ এবং শিল্পজ্ঞানের প্রয়োজন তা শ্রীমতী ঘোষের অনায়ত্ত মনে হল। শুধু আরতি গুপ্ত, কৃষ্ণাশ্রী বসু প্রভৃতি কয়েকজন শিল্পীর পারদর্শিতাই এক্ষেত্রে কয়েকটি নাচকে সহনশীল করেছে।

'বর্ষামঙ্গল' দেখে আর একটি কথা মনে হল। গানের মাঝে কবিতা-পাঠের প্রচলিত রীতিটি বর্জন করা দরকার। কারণ পর পর গানগুলি গেয়ে গেলেই সবচেয়ে ভাল হয়। তাছাড়া এগুলি শ্রোতাদের বিরক্তি উৎপাদন করা ছাড়া আর কোন কাজেই আসে না। নাচের মত লোভনীয় জিনিষ এবং গানের মাঝে এই কাব্য পাঠ কোন শ্রোতাই বরদাস্ত করতে পারেন না দেখেছি! কোন নাম করা সিনেমার অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে ব্যঞ্জনার ভার দিলেই শ্রোতার দল নিশ্চুপ থাকেন। নিজেদের চোখ ঠেরে লাভ নেই। দুঃখের হলেও একথা স্বীকার করা ভাল।

হীরেন বসু

একতারা : সন্তোষকুমার দে। সোয়ান বুক্‌স্। দু'টাকা।

গল্প-উপন্যাস লেখক হিসাবেই মুখ্যত শ্রীসন্তোষকুমার দের পাঠক মহলে পরিচিতি। কিন্তু অধিকাংশ আধুনিক লেখকদের মত তিনিও যে উচ্চারিতায় অভ্যস্ত তার প্রমাণ পাওয়া গেল 'একতারা' কাব্যগ্রন্থখানি হাতে আসতে। আর কবিতা রচনায় সন্তোষবাবু শুধু অভ্যস্তই নন, পারদর্শীও—'একতারা' তারই উজ্জ্বল নিদর্শন। বিভিন্ন রসের বেশ কিছু সংখ্যক কবিতার সঙ্কলন এই গ্রন্থখানি। একদিকে যেমন রয়েছে সমাজ-চিন্তা, প্রকৃতি-সচেতনতা, পূর্বসূরীদের প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদন, তেমনি আর একদিকে আছে সহজ হাল্কা-কৌতুক। এই শেষোক্ত ক্ষেত্রে আধুনিক কবিদের পদচারণা বিরল বলেই সম্ভবত উল্লেখ্য।

সমকালীন যুগের দিকে পিঠ ফিরিয়ে যাঁরা কবিতা রচনা করেন আলোচ্য কবি সে দলের নন। কিন্তু তাঁর যুগ-চেতনা আর প্রকৃতি-চেতনা এক হয়ে মিশে গেছে। কবি বলছেন :

শ্রাবণ, আমার সাধ্য নেই আজ আবাহনের অর্ঘ্য রচি
নিরাশ্রয়ের কুঁড়ের তলায় ঠাঁই নিয়েছে কাঁচা-কচি।
তাদের মাথা বাঁচবে কিসে তাই ভেবে যে পাইনে দিশে
কাব্য আমার যাচ্ছে মিশে হতাশ মনে দীর্ঘশ্বসি'।

এবং,

'বর্ষা এলায়েছে তার মেঘময় বেণী'—
কালশিরা, বরিশাল, নোয়াখালি, ফেণী
এখনও কি ধূমেভরে? উঠে আর্তস্বর
মূর্ছাহত বিদ্ধচিত্ত ধরণীর পর?

জীবনজিজ্ঞাসার প্রকাশ ঘটেছে 'নাটক' কবিতাটিতে। এখানে জীবন সম্পর্কে এক অনন্ত দৃষ্টি-ভঙ্গীরও পরিচয় পাওয়া যায়। মাঝে মাঝে হতাশার কণ্ঠ শোনা গেলেও কবি যে জীবন সম্পর্কে আস্থাশীল অনেক কবিতায়ই তার পরিচয় রয়েছে। 'জীবন বিবর্ণ নয়, বৃথা নয়, মিছা নয়'। 'ঘড়ি' এবং 'তির্যক তরজা' কবিতায় কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ রয়েছে।

কৌতুক রচনাগুলি হাস্যরসের শুভ্র দ্যুতিতে সমুজ্জ্বল। 'হিসাব', 'চুট্‌কি' প্রভৃতি তার পরিচয় বহন করছে।

কিন্তু বইটি মুদ্রণের দিক দিয়ে আরো পরিপাটি হওয়া উচিত ছিল। ভাল কবিতা, ভাল কাগজে ছাপা হয়েছে, কিন্তু ছাপা তেমন ভাল নয়।

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

উদার স্বার্থপরতা

সমাজসমস্যার দুটি দিক। এক, সমাজের মানুষ, আর দ্বিতীয়, মানুষের সমাজ। সমাজ আর মানুষ, একে অন্যের পরিপূরক। মানুষের মনের পরিধি তার সমাজকে বিস্তৃতির পথে নিয়ে চলে, অন্য-দিকে সমাজ তার আপন গণ্ডীতে মানব সমষ্টিকে বাঁধতে চায়। এই দোটানায় মানুষের সঙ্কীর্ণ-স্বার্থপরতা জয়লাভ করে এবং বিভিন্ন সমষ্টি তখন নিজেদের এক একটা ভিন্ন ভিন্ন ছাঁচে ঢালতে চায়, —গড়ে ওঠে নূতন নূতন মতবাদ। সমষ্টির কল্যাণ তখন হয়ে ওঠে মতবাদের কল্যাণ—আর এর থেকেই জন্মে ওঠে অশান্তির আগুন।

সঙ্কীর্ণ-স্বার্থপর মানুষ যেমন নিজেকে অপর দশের থেকে পৃথক করে দেখে, তাদের সমষ্টিও তেমনি অপর সমষ্টিকে সন্দেহের চোখে দেখে। সমষ্টির সংজ্ঞাও সেইমত তৈরী হয়। এইভাবে ভৌগোলিক বা আঞ্চলিক সমষ্টি জাতিগত বা অর্থগত বৈষম্যের সমষ্টি, সমাজ-বিজ্ঞান সম্মত সমষ্টি ইত্যাদি বিভিন্ন সমষ্টি ভেদ দেখা দেয়। কেহ বা নিজের ভালত্ব অপর সমষ্টির উপর চাপাবার জন্যে আবার কেহ বা আপন সমষ্টির আত্মরক্ষার ধুয়া তুলে অপরকে ধ্বংস করবার জন্যে মসী ও অসির আশ্রয় গ্রহণ করে। এরপর আছে পৃথিবীর একপ্রান্ত হতে অপর প্রান্তের মধ্যে আপন সমবিশ্বাসী সমষ্টিদের মধ্যে জোট বাঁধা ও তা থেকে বৃহত্তর অশান্তির সৃষ্টি। এই হল সমষ্টির ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান।

সমষ্টিগত মানুষ,—সঙ্কীর্ণ স্বার্থপর মানুষ তাই জনসাধারণের শান্তির পরিপন্থী। অপরদিকে ব্যষ্টিগত উদার বা অবাধ-স্বার্থপর মানুষই জীবজগতের স্বার্থরক্ষায় সমর্থ। কথাটা আরও বিশ্লেষণের প্রয়োজন।

স্ব-শব্দে—স্বার্থ বা নিজ। গত সংখ্যায় শ্রীহীরেন বসুর "সমাজসমস্যা" নিবন্ধে মিঃ এ, টি, বলের দৃষ্টান্ত পর্য্যালোচনা করা যাক। মিঃ বল মেসার্স রেকেট এণ্ড কোলম্যান অব্ ইণ্ডিয়া লিমিটেডের ডিরেক্টর ও ম্যানেজার। বালিতে ভেজাল দেওয়ার উদ্দেশ্য তাঁর হতে পারে দুটি। একটি হল ভেজাল মিশিয়ে নিজের পকেট ভারী করা অর্থাৎ স্বীয় পরিবারবর্গের তুষ্টি অন্যটি হল কোম্পানীর শেয়ার হোলডারদের তুষ্টি। দুই ক্ষেত্রেই যে সমষ্টির তুষ্টির জন্য এটাই লক্ষ্যণীয়। সঙ্কীর্ণ স্বার্থপরতার এটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। উদার বা অবাধ স্বার্থপরতার সঙ্গে এর অনেক প্রভেদ। একটি ক্ষুদ্র সমষ্টিই কেবল মানুষের আপনার হতে পারে না। সমস্ত বিশ্বজগৎ তার নিজেরই।

সমষ্টির জোট বাঁধা আর খাদ্যে ভেজাল দেওয়া এই দুই-ই এক শ্রেণীর অপরাধ। বীজাণু-যুদ্ধের সঙ্গে আপাতদৃষ্টিতে এর আদর্শগত প্রভেদ না দেখলেও ফলতঃ এই দুয়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। দুইই জীবজগতের অকল্যাণকর।

উৎকোচ গ্রহণ হল আরও একটি অসামাজিক কাজ যা এই সব অকল্যাণকর কার্য্যগুলির সহায়তা করে। দাতা ও গ্রহীতা এই দুইপক্ষের উপস্থিতিতেই উৎকোচের উদ্ভব। যেমন উৎকোচদাতার

অভাবে গ্রহীতার সংস্থান হয়না তেমনি গ্রহীতার অভাবে দাতার সংস্থান হয় না। ভিক্ষাদান দাতার পুণ্যকর্ম্ম, তার উত্তমপুরুষের পারলৌকিক সংস্থান। উৎকোচ দান দাতার অপকর্ম্ম,—তার অধম পুরুষের পার্থিব সংস্থান। এই পার্থিব সংস্থানের অনুপ্রেরণায়, সমষ্টির ব্যষ্টিবিশেষ স্বার্থপরতায় মনোনিবেশ করে।

সমষ্টিবিশেষও চিরকাল এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে এসেছে। আর্ট ও শিল্পে ভেজাল হিসাবে হীন ইন্দ্রিয় উদ্দীপনার চিত্র ও সাহিত্য বিভিন্ন সমষ্টির মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছে। বিলাস ব্যসনের ভেজাল মানব জাতির স্বভাব কৃষ্টিকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে। বিভিন্ন সমষ্টির মধ্যে মাদক দ্রব্যাদি ছড়িয়ে দিয়ে সমষ্টির পর সমষ্টিকে করেছে হীনবল। সাহায্যের নাম করে অর্থ, অস্ত্র, খাদ্য ও লোকবলের উৎকোচ প্রদান করে আপন সমষ্টির অকল্যাকর সামাজিক পথের সহায়তায় সমষ্টিবিশেষের মৌন-সম্মতি আদায় করে নিয়েছে।

কোনও বিশ্ব ইউ এন ও যেমন এই ভেজাল ও উৎকোচ বন্ধ করতে সক্ষম হয়নি তেমনি কোনও গভর্মেণ্টের কাছ থেকেও সম্পূর্নরূপে এই উৎকোচ বা ভেজাল ব্যবস্থার আমূল উৎপাটন আমরা আশা করতে পারি না। প্রয়োজন ব্যষ্টিবিশেষের অবাধ বা উদার স্বার্থপরতা, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষ যখন ভাববে যে আমার শুধু পরিবারই নেই, শুধু বাংলাদেশই নেই, শুধু ভারত বা এশিয়া বা পৃথিবীই নেই—আছে সারা সৌরজগৎ—প্রত্যেকেরই—তথা আমারও।

নরেন্দ্রকুমার মিত্র

ঘৃত শিল্পের সঙ্কট

বাংলা দেশ আজ খাদ্য-সমস্যার সম্মুখীন—। খাদ্যাখাদ্য বিচারের সুযোগ সুবিধা মিলিতেছে না। কিন্তু তবুও, গুণাগুণ বিচার করিলে দুধ-ঘির তুল্য পুষ্টিকর খাদ্য আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বাংলার চাহিদা মিটাইতে বহুল পরিমাণে ঘি অন্যান্য প্রদেশ হইতে আমদানী করা হয়, তাহার ভিতর শতকরা প্রায় সত্তর ভাগ আসে অন্ধ্র প্রদেশের বিখ্যাত ঘি-ব্যবসাকেন্দ্র গুনটুর হইতে। এই গুনটুরের ঘি 'গাওয়া-ঘি' বলিয়া বাংলাদেশে প্রচলিত।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার সর্ব্ব-ভারতের ঘিয়ের একই মান (আর, এম, ভ্যালু—২৮) স্থির করিতে মনস্থ করিয়াছেন। যদি তাঁহাদের ১৯৫৪ সালের খাদ্যে ভেজাল নিয়ন্ত্রণ আইন (Food Adulteration Act, 1954) বলবৎ করা হয় তাহা হইলে আমরা আশঙ্কা করি ভেজাল-সমস্যার সমাধান না হইয়া সমস্যা আরও গুরুতর হইবে। কারণ বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞের মতে সকল দেশের ঘিয়ের মান এক প্রকার হয় না বা হইতে পারেন না, যেহেতু এই আর, এম, ভ্যালু নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের জলবায়ু, গরুর স্বাস্থ্য, খাদ্য, তৃণভূমি, গো-পালন প্রভৃতির উপর। তাহা ছাড়া গব্য-ঘৃত, ভঁয়সা-ঘৃত ও গব্য-ভঁয়সা মিশ্রিত ঘৃতের মানেরও অনেক তারতম্য হয়। ১৯১৯ সালে যখন বাংলা সরকার তাঁহাদের Bengal Food Adulteration Actএ ঘিয়ের মান ৩০ আর, এম, ভ্যালুতে স্থির করিতে মনস্থ করেন, তখন উচ্চ পদস্থ সরকারী ও কর্পোরেশনের কর্ম্মচারীর দ্বারা গঠিত

একটি প্রতিনিধি দলকে সরকার গুনটুরে পাঠাইতে বাধ্য হন। তাঁহারা সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় সংকলন করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে যেহেতু গুনটুরের ঘিয়ে গব্য-ঘৃতের মাত্রা অধিক পরিমাণে বিদ্যমান এবং যেহেতু গব্যঘৃতের আর, এম, ভ্যালু অপেক্ষাকৃত কম, সেই হেতু গুনটুরের ঘিয়ের মান (Standard) আর, এম, ভ্যালু ২৪ হওয়া উচিত এবং তৎকাল হইতে অদ্যাবধি সেই মানই আইনমত প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং যদি কেন্দ্রীয় সরকার ঘিয়ের মান আর, এম, ভ্যালু —২৮ করাই স্থির করেন, তাহা হইলে বাংলার বাজার হইতে 'বিশুদ্ধ' হইয়াও 'অ-বিশুদ্ধ' বলিয়া গুনটুর হইতে আনীত 'গাওয়া-ঘি' অদৃশ্য হইবে এবং বাঙ্গালী যে অল্প-পরিমাণেও ঘি পাইতেছিল, তাহাও আর পাইবে না। আর গুনটুরের ঘি-ব্যবসায়ী ও ঘি-প্রস্তুতকারিদের দুরবস্থার কথা না-হয় নাই বলিলাম।

যাহা হউক, কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আমাদের বিনীত অনুরোধ, জনকল্যাণের জন্য যাহা তাঁহারা করিতেছেন, তাহাতে যেন জন-স্বার্থ সুরক্ষিত হয়। আর, এম, ভ্যালু ২৮—ঘিয়ের এই সর্ব্বভারতীয় মান নির্দ্দিষ্ট করিবার পূর্ব্বে প্রত্যেক প্রদেশ হইতে বৈজ্ঞানিক ও বিশেষজ্ঞের সুচিন্তিত সুপরীক্ষিত বিশুদ্ধতা নিয়ামক মান (আর, এম, ভ্যালু) ভালভাবে সংগ্রহ করিবার পর যেন তাঁহারা ঘিয়ের মান-নির্ণয়ের নির্দ্দেশ দেন। আমরা বিশ্বাস করি বৈজ্ঞানিক যুক্তির উপর ভিত্তি করিলে সরকারের এই সাধু প্রচেষ্টার জন্য দেশবাসী বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকিবে।

অবিনাশ দত্ত

আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত কর্ত্তৃক ২৪, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও ৪১, বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীটস্থ সার্ভিস্ প্রিণ্টার্স হইতে মুদ্রিত।